الله
رسول
محمد
মাহমুদ শীত খাত্তাব রচিত
সিরাত-কাননের
মুঠো মুঠো
সৌরভ
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ
অনূদিত

✷

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এই অনুপম আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জামানায় এবং তাঁর ওফাতের পরও ইসলামের বিজয়ের যুগে মুসলিমরা সংখ্যায় অতি অল্প হয়েও মুশরিক ও ইহুদিদের বড় বড় বাহিনিকে পরাজিত করেছে; এমনকি রোম ও পারস্যের মতো পরাশক্তির দম্ভও তারা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ইসলামের এই বিজয়ের যুগ ১১শ হিজরি থেকে ৯২তম হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়ের ধারাবাহিকতায় সময়ের এই স্বল্প পরিসরে ইসলামি সম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে চীন, পশ্চিমে ফ্রান্সের মধ্যভাগ; উত্তরে সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

✷

শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের এই বিজয় নিছক সামরিক বিজয় নয়, বরং এটি হলো ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের বিজয়। যখনই তারা বদলে গেল, তাঁদের আকিদা-বিশ্বাসে দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটল, তাদের বিজয়ের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। সময়ের পরিক্রমায় ক্রমশ দুর্বল হতে থাকল একসময়ের পরাক্রমশালী মুসলিম উম্মাহ, মর্যাদার সুউচ্চ পর্বতশিখর থেকে তাঁরা ছিটকে পড়ল লাঞ্ছনার অতল সাগরে।

সিরাত-কাননের

মুঠো মুঠো সৌরভ

সিরাত-কাননের মুঠো মুঠো সৌরভ

মাহমুদ শীত খাত্তাব

রুহামা পাবলিকেশন

না জ রা না

‘জান্নাতের যত সবুজ পাখি’

সর্বাঙ্গে রক্তিম সৌরভ মেখে মুক্তির আনন্দে যারা ধুলোয় গড়াগড়ি খায় আর নিমিষেই পালিয়ে যায় অনন্ত জীবনের সীমানায়; বাসা বাঁধে আরশে আজিমের সুশীতল ছায়ায়; ডানা মেলে ফিরদাওসের মুক্ত আঙিনায়—যেখানে দোল খায় ফলভারে আনত চিরহরিৎ বৃক্ষের পল্লবিত শাখা; কুলকুল রবে বয়ে যায় দুধের নদী, মধুর স্রোতস্বিনী।’

‘পাখি হতাম যদি’

– হাবীবুল্লাহ মিসবাহ

অনূবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، فَجَعَلَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، وَجَعَلَ فِيْهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَفَجِّرْ لَهُمْ يَنَابِيْعَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ تَفْجِيْرًا

হাজার বছর আগে সুদূর আরবের ঊষর মরুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক মহামানব—মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ। দীর্ঘ ৬৩ বছরের সোনালি জীবনে তিনি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আলোর পয়গাম; পথহারা উদ্বাস্তু মানবজাতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাস্তুভিটায় ফেরার অমূল্য মানচিত্র—কুরআনুল কারিম; আর এই মানচিত্রের ব্যাখ্যামূলক পথ-নকশা—পবিত্র সুন্নাহ। ২৩ বছরের নিরলস সাধনায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক মহিমান্বিত কাফেলা—সাহাবায়ে কিরাম। প্রতিটি যুগে এই কাফেলার পদচিহ্ন অনুসরণ করে যাত্রা করেছে আরও অগণিত কাফেলা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসেছে; কাফেলার পর কাফেলা সেজেছে। পূর্বসূরি কাফেলার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথ চলেছে উত্তরসূরি কাফেলা—জীবনের মরুভূমি পাড়ি দিয়ে যাত্রা করেছে আপন দেশে।

সবাই জানে এসব কাফেলার সর্দার মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ। তিনিই ঠিকানাহীন মানবতাকে দেখিয়েছেন ঘরে ফেরার পথ; মহাকালের তিনিই মহানায়ক—জান্নাতগামী এই উম্মাহর তিনিই পথপ্রদর্শক। তাই কাফেলার প্রতিটি মুমিন তাদের এই মহান নেতার জন্য উৎসর্গিত; তাঁর উম্মত হওয়ার গৌরবে উচ্ছ্বসিত।

মুমিনের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত পাপড়ি মেলে ভালোবাসার বাহারি ফুল; রূপ-রস-গন্ধে কানায় কানায় ভরে থাকে তাঁর জীবন-কানন। এই ভালোবাসা মরুর দুলাল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য; হৃদয়ের বাদশাহ প্রিয় আহমাদ ﷺ-এর জন্য।

প্রিয় নবির এই ভালোবাসা একজন মুমিনের ইমান—তার দ্বীন-দুনিয়ার সুখ ও সাফল্যের জামিন। এই ভালোবাসা তার হৃদয়ের আলো—তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতার চেয়ে, তার সন্তানের চেয়ে এমনকি সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।'[১]

মুমিনের হৃদয়ে যখন দানা বাঁধে প্রিয় নবির ভালোবাসা, তখন সে তাঁকে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে : তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁর আচরণ কেমন ছিল, তাঁর চলাফেরা কেমন ছিল, তাঁর জীবন ও জীবনদর্শন কেমন ছিল। কথায় আছে, (مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ) 'মানুষ প্রিয়জনের কথাই বেশি বলে।' আর প্রিয় নবি ﷺ-কে জানার উপায় হলো তাঁর সিরাত। তাই মুমিন মাত্রই সিরাতুন্নবির মনোযোগী পাঠক।

***

সুন্নাহর অনুসরণ প্রিয় নবি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ—এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনকেও ভালোবাসার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

'(হে নবি,) আপনি বলে দিন, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।"'[২]

১. সহিহুল বুখারি : ২৫।
২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৩১।

তাই মুমিনের হৃদয়ে যখন ফোটে নবিপ্রেমের জান্নাতি পুষ্প, সুন্নাহর সৌরভে ঝলমল করে ওঠে তাঁর জীবন। সে তখন হয়ে ওঠে প্রিয়তম মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্মল প্রতিচ্ছবি। সে যখন বলে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই বলে; যখন চলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই চলে। যখন খাবার খায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই খায়; যখন ঘুমায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই ঘুমায়। মুখাবয়বে তার আলো ছড়ায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর পৌরুষদীপ্ত দাড়ি আর দেহজুড়ে শোভা পায় মুহাম্মাদের জুব্বা-পাগড়ি। এককথায় সে সুন্নাহকেই বানিয়ে নেয় জিন্দেগির মানহাজ।

***

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহই মানবজীবনের সাফল্য ও কামিয়াবির একমাত্র পথ। আর সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে যেতে হবে সিরাতুন্নবির আলোকিত পাঠশালায়।

প্রিয় ভাই ও বোন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জীবন ও তাঁর সুন্নাহ সম্পর্কে জানার লক্ষ্যেই আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন—'সিরাত-কাননের মুঠো মুঠো সৌরভ'

***

প্রথমে বইটির সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই। এটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমরবিদ ও সিরাত-বিশারদ শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব رحمه الله। শাইখকে নিয়ে আমরা বইয়ের শুরুতে আলাদা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সিরাতটির মূল আরবি নাম (وَمَضَاتٌ مِنْ نُوْرِ الْمُصْطَفَى)। বইটির বিন্যাস প্রচলিত সিরাতগ্রন্থ থেকে একেবারেই আলাদা। শাইখ এখানে সিরাতশাস্ত্রের অনেকগুলো শাখার সারনির্যাস নিয়ে এসেছেন। তাই সিরাত পাঠের ভূমিকা হিসেবে বইটি বেশ উপযোগী মনে হয়। যারা দীর্ঘ পরিসরের সিরাত পড়ার পূর্বে গোটা সিরাতকে একনজরে দেখে নিতে চান, আমরা বলব, তাদের জন্য বইটি চমৎকার এক উপহার।

বইয়ের শুরুতেই লেখক জুড়ে দিয়েছেন সারগর্ভ এক ভূমিকা, যেখানে তিনি পুরো সিরাতের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। ভূমিকার পর প্রথম

অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম থেকে অফাত পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপন করেছেন এক অভিনব পদ্ধতিতে—যাতে স্বল্প পরিসরেও পাওয়া যায় পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির ছাপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ। এই দুটি অধ্যায় যেন 'আশ-শামাইলুন নাবাবিয়্যাহর' সারনির্যাস। চতুর্থ অধ্যায়ে এসেছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এক সারগর্ভ আলোচনা—যা পাঠককে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর (نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ) পরিচয়টির স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য করবে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, প্রজন্ম বিনির্মাণে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মানহাজ নিয়ে। সাতটি সংক্ষিপ্ত দরসে তিনি নববি তারবিয়াহর একাধিক মূলনীতি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বইটির উপসংহারটিই বোধহয় সর্বাধিক তাৎপর্যময়। উপসংহারে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিজয়ের কারণ ও উপকরণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের সামরিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অনন্য ছাপ ফুটে উঠেছে এই আলোচনাগুলোতে। পঞ্চম অধ্যায় ও উপসংহার ফিকহুস সিরাহর অন্তর্গত। পাঠক এই দুটি অধ্যায়ে জানতে পারবেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাংগঠনিক ও জিহাদি জীবনের বেশ কিছু মূলনীতি নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এক পর্যালোচনা। এভাবে বইটিতে উঠে এসেছে সিরাতশাস্ত্রের একাধিক শাখার সারনির্যাস। সব মিলিয়ে 'সিরাত-কাননের মুঠো মুঠো সৌরভ' বাংলা সিরাত-সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন বলে আমরা মনে করি।

***

এবার বইটির অনুবাদ ও পরিমার্জন প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করি। আমরা বইটি নিছক অনুবাদ করেছি বিষয়টি এমন নয়—বইটির যুগোপযোগী বিন্যাস ও আলোচনার সমৃদ্ধির দিকেও আমরা মনোযোগ দিয়েছি। বইয়ে উল্লেখিত নসগুলোর তাখরিজ ও মান নির্ণয়, তথ্যগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই, প্রয়োজনে ব্যাখ্যামূলক টীকা সংযোজন ইত্যাদির দিকেও ছিল আমাদের সতর্ক দৃষ্টি। এই কাজগুলো করতে গিয়ে আমাদের অনেক সংযোজন-বিয়োজন করতে হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব :

- কুরআনের আয়াতগুলোর পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।
- হাদিসগুলোর উদ্ধৃতি সংযোজন ও মান যাচাই করা হয়েছে। অতি দুর্বল ও জাল হাদিসগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।
- সিরাতের মূল উৎসগ্রন্থগুলো সামনে রেখে তথ্যগুলো যাচাই করা হয়েছে এবং তথ্যবিভ্রাটগুলো সংশোধন করা হয়েছে। অধিক বিশুদ্ধ ভিন্নমত থাকলে টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রথম অধ্যায়ের শেষে 'একনজরে সিরাত' নামে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক আলোচনাটিকে নতুন করে বিন্যাস করা হয়েছে এবং আলোচনাটি সমৃদ্ধ করার তাগিদে বিশুদ্ধ উৎস থেকে অনেক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং শেষে 'একনজরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য' নামে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে—যাতে পুরো অধ্যায়ের সারনির্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক আলোচনাটিকে বিন্যস্ত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ উৎস থেকে বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং অধ্যায়ের শেষে 'একনজরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' নামে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে জিহাদের পরিচিতি বিষয়ক একটি ছোট্ট পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুরআনের আয়াতগুলোকে খানিকটা বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সংযোজন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বেশ কয়েকটি মওজু ও জয়িফ জিদ্দা হাদিস বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তার বদলে সহিহ হাদিস সংযোজন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিছু কিছু বিষয়কেও ঈষৎ পরিমার্জিত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন জায়গায় ব্যাখ্যা ও সংশয়-নিরসনমূলক টীকা সংযোজিত হয়েছে।
- অধ্যায়গুলোর শুরুতে কিছু নুসুস ও বাণী সংযোজন করা হয়েছে।

***

প্রিয় নবি ﷺ-এর সিরাত নিয়ে কাজ করার আশা আমার বহু দিনের। অবশেষে দয়াময় মালিক তাঁর তুচ্ছ এক বান্দার তামান্না পূরণ করলেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ আওয়ালান ওয়া আখিরান।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো ধরনের পরামর্শ, সংশোধনী ও সমালোচনা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের এই টুটাফাটা আমলকে নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন, আমাদের সবার অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করেন এবং খাইরুল ওয়ারা ﷺ-এর সিরাত নিয়ে আমাদের এই দুর্বল মেহনতকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন।

দোয়া কামনায়
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ
২৪ নভেম্বর, ২০২০ ইসায়ি

প্রখ্যাত গবেষক, ঐতিহাসিক, সমরবিদ
মাহমুদ শীত খাত্তাব ﷺ-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব জন্মেছিলেন ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ে; চারদিকে তখন উত্থান-পতনের ফেনিল জোয়ার—বাঁধভাঙার গগনবিদারি আওয়াজ। তাই দুনিয়া-কাঁপানো অনেক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছেন তিনি। ১৯১৯ সালে উত্তর ইরাকের মসুল শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা দুজনই আরব। পিতার দিক দিয়ে তিনি সাইয়িদুনা হাসান বিন আলি ﷺ-এর বংশধর। তাঁর মা মুসেলের বিখ্যাত আলিম শাইখ মুস্তফা বিন খালিলের মেয়ে।

তার জন্মের কয়েক মাস পর তার দ্বিতীয় আরেকটি ভাইয়ের জন্ম হয়। ফলে এক বছরের মাথায় তিনি মায়ের কোল হারান—প্রতিপালিত হন তার দাদির কোলে। দাদি ছিলেন একজন দ্বীনদার পরহেজগার তাহাজ্জুদগুজার পুণ্যবতী নারী। তার মুবারক হাতেই তিনি তরবিয়ত লাভ করেন।

শৈশবেই তিনি কুরআন হিফজ করেন। তারপর মুসেলেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেন। মুসেলের মসজিদে শাইখদের দরসগুলোতে তিনি নিয়মিত বসতেন। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি আরবি ভাষা ও শরিয়াহর ইলম অর্জন করেন।

যুবক মাহমুদ চেয়েছিলেন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবেন। কিন্তু নিয়তি এসে তার নিয়তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাকে ভর্তি হতে হয় সামরিক কলেজে। ঘুরে যায় তার পড়াশোনার মোড়। এভাবেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি হয়ে ওঠেন সামরিক বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল আর মুসলিম উম্মাহ লাভ করে একজন প্রতিভাবান সমরবিদ, ঐতিহাসিক ও সিরাত-গবেষক।

সমরশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ইলম অর্জনের পিপাসা

তাকে পৌঁছে দেয় এক অনন্য উচ্চতায়। সমরশাস্ত্রের মতো তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও ইসলামি শরিয়াহয়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি জামিয়া আজহারের ইসলামি গবেষণা বোর্ড, জর্দান ও দামেশকের আরবি ভাষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আরবি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। আরব-বিশ্বের বিখ্যাত অনেক রেডিও ও টিভি চ্যানেলে তিনি সিরাত, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন।

তার সব পরিচয় ছাপিয়ে তার লেখক ও গবেষক পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠে। তার লেখা ও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, সিরাতুন্নবি ﷺ, সাহাবিদের জীবনী, ইসলামের বিজয়-যুগের ইতিহাস, ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের জীবনী, তাদের যুদ্ধকৌশল, ইসলামি সমরশাস্ত্র, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ইসরাইলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- আর-রাসুলুল কায়িদ।
- আস-সিদ্দিকুল কায়িদ।
- আল-ফারুকুল কায়িদ।
- কাদাতুন নাবি ﷺ।
- কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাজিরাহ।
- কাদাতু ফাতহি ফারিস।
- কাদাতু ফাতহি বিলাদিশ শাম ওয়া মিসর।
- আল-আসকারিয়াতুল ইসরাইলিয়্যাহ।
- বাইনাল আকিদাতি ওয়াল কিয়াদাহ।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের রচনাবলি ইসলামি কুতুবখানার অনেক বড় একটি শূন্যতা পূরণ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের বড় বড়

সেনাপতিদের যুদ্ধের ইতিহাস ও তাঁদের সমরকৌশল নিয়ে তার মতো বিশ্লেষণ ও গবেষণানির্ভর রচনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি বললেই চলে।

বিভিন্ন ইসলামি সম্মেলন ও সেমিনারে তিনি আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করতেন। আরব-আজমের বড় বড় আলিমদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-সহ অনেক বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের সঙ্গে তিনি জেলে গিয়ে দেখা করেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-কে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য তাদবির করেন।

এত স্বল্প পরিসরে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মমুখর জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি কলমের টানে যতটুকু এসেছে, যে কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে লিখেছি। তার জীবনী নিয়ে ছোটবড় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমি পাঠক ভাইদেরকে সংক্ষেপে তাকে জানার জন্য তার ছাত্র আব্দুল্লাহ মাহমুদ রচিত (اللِّوَاء الركن محمود شيت خطاب المجاهد الذي يحمل سيفه في كتبه) নামের বইটি পড়ার পরামর্শ দেবো।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব ১৯৯৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান পরপারে। আল্লাহ তাআলা এই মহান মনীষীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। (আমিন)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের নেতা, আমাদের সর্দার, আমাদের আদর্শ, আমাদের রাহবার, আমাদের পথপ্রদর্শক। তাই সিরাত অধ্যয়ন এবং সুন্নাহর অনুসরণই যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি...

তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রিয় নবি ﷺ-এর সুরভিত সিরাতের চর্চা করা অতীব জরুরি—চাই সে রাজা হোক বা প্রজা, নেতা হোক বা কর্মী, আলিম হোক বা জাহিল, ধনী হোক বা গরিব, সেনাপতি হোক কিংবা সাধারণ সৈনিক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক সিরাত শুধু যে আপনার বোধবুদ্ধিকে সংহত করে তা নয়; বরং আপনার হৃদয়কেও ছুঁয়ে যায়। প্রতিটি অধ্যয়নকারীই সিরাত থেকে উপকৃত হয়। তাঁর কাজকর্ম ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত; তাঁর কথাবার্তা কুরআনুল হাকিমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ; তাঁর আচার-ব্যবহার কুরআনেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি; তাঁর মানহাজ ও কর্মপদ্ধতিই সকল যুগের দায়িদের চলার পথ।

সিরাতের সঙ্গে আমার সখ্যতা সেই শৈশব থেকেই; তাই কচি বয়সেই আমার মনোজগতে সিরাতের গভীর ছাপ পড়ে।

এই বইয়ে আমরা খণ্ডচিত্রে সিরাত সংকলন করার প্রয়াস পেয়েছি; তবে টুকরো দৃশ্যে রচিত হলেও এতে পাঠক পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির স্বাদ পাবেন। আলিম-জাহিল, ছাত্র-শিক্ষক সবাই এই পুস্তিকা থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবেন। এমনকি দায়িরাও জোগাড় করতে পারবেন তাদের দাওয়াহ-প্রকল্পের প্রয়োজনীয় রসদ।

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই ছোট্ট বইটি থেকে পাঠকদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন এবং আমাদের ছোট্ট এই আমলটিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য। সালাত ও সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবি ﷺ-এর ওপর, যিনি আমার সর্দার, আমার মনিব, সকল নেতার সর্দার, সকল সর্দারের নেতা, সাহসীদেরও যিনি সাহসী, বীরদেরও যিনি বীর, সকল মুজাহিদের যিনি ইমাম, সৌভাগ্যবান নেককারদের যিনি পথপ্রদর্শক।

ইসলামের বিজয়ের জন্য লড়াইরত সকল মুজাহিদ সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। দ্বীনের বুদ্ধিবৃত্তিক সীমান্তের প্রহরায় নিয়োজিত সকল সেনাকমান্ডার ও সৈনিককে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আরবি ভাষা চর্চার মাধ্যমে, ইসলামি আকিদার প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়িমের মাধ্যমে যারা কুরআনের খিদমতে ব্যাপৃত আছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

- মাহমুদ শীত খাত্তাব
১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায় : প্রজন্ম বিনির্মাণে রাসুলুল্লাহর কর্মপদ্ধতি

উপসংহার : বিজয়ের কারণ ও উপকরণ

প্রখ্যাত গবেষক, ঐতিহাসিক, সমরবিদ ও
সিরাত-বিশারদ মাহমুদ শীত খাত্তাব ﵀-এর

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-কে গোটা মানবজাতির কাছে রাসুলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মতের কাছে পৌঁছে দেন রিসালাতের আমানত; সর্বশক্তি ব্যয় করে জিহাদ করেন আল্লাহর পথে। ফলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয় এসে তাঁর পদচুম্বন করে; লোকেরা দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায়।

নবুওয়ত-লাভের পূর্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সচ্চরিত্রের জীবন্ত নমুনা। সততা, সাহস, দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততায় গোটা আরবে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। তাই মক্কা নগরী ও তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে (اَلصَّادِقُ الأَمِيْنُ) 'বিশ্বস্ত সত্যবাদী' বলে ডাকত।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর, জিবরাইল ﵇ তাঁর কাছে নিয়ে আসেন রিসালাতের পয়গাম। তখন তিনি হেরা গুহায় ইবাদতরত ছিলেন। জিবরাইল ﵇ প্রথমবারের মতো তাঁর সামনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন :

﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝٣ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾

'পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার রব তো মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন—শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[৩]

৩. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ১-৫।

নবুওয়তপ্রাপ্তির পর তিনি বেশ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। লোকদেরকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দেন আর জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেন। এদিকে কুরাইশের মুশরিকরা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এবং নানানভাবে কষ্ট দিতে শুরু করে। সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি দাওয়াহর কাজ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তারা তাঁকে 'আল-বালাদুল আমিন'[৪] মক্কা থেকে বের করে দেয়। বাধ্য হয়ে তিনি একজন সঙ্গীকে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। ইসলামের দাওয়াহর প্রশ্নে তিনি কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। দ্বীনের দাওয়াতই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। দাওয়াহর পথে তিনি নিজের জান-মাল কুরবান করতেও দ্বিধা করেননি।

মুসলিমদের প্রথম ঘাঁটি মদিনা মুনাওয়ারায় শুরু হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নতুন জীবন। আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এক কঠিন সংগ্রামে। ক্রমবিকাশমান মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তিনি সমবেত ও সংহত করেন; তাদের মাঝে সঞ্চার করেন উদ্যম ও শক্তি। দ্বীনের দাওয়াহকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে তিনি তাঁর নবিসুলভ হিকমাহ ও প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে প্রণয়ন করেন একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা।

নবুওয়ত-লাভের পর থেকে রফিকে আলার[৫] ডাকে সাড়া দেওয়া পর্যন্ত পুরো জীবন তিনি ব্যয় করেছেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে : মক্কায় তাওহিদের দাওয়াহর আওতায় জিহাদের জন্য লোকদের প্রস্তুত করেছেন, আর মদিনায় তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেছেন। তিনি যখন রফিকে আলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান, ততদিনে পুরো জাজিরাতুল আরব[৬] তাওহিদের বন্ধনে ইসলামের পতাকার নিচে সমবেত হয়েছে; আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং পুরো মানবজাতির জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন—যাতে গোটা পৃথিবী ও পৃথিবীর বাসিন্দারা আল্লাহর শরিয়াহর অধীনে চলে আসে।

---

৪. আল-বালাদুল আমিন মানে নিরাপদ নগরী। এটি মক্কার উপাধী।

৫. পরম বন্ধু তথা আল্লাহ তাআলা।

৬. জাজিরাতুল আরব মানে আরব উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের জলসীমার পশ্চিমে আছে লোহিত সাগর, উত্তর-পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে ভারত উপসাগর। এই উপদ্বীপে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ইয়ামান।

ইসলামি শিক্ষা অর্জন করা ব্যক্তিগত ইবাদত; যার উদ্দেশ্য প্রতিটি মুসলিমকে ইসলামি সমাজের উপকারী উপাদানে পরিণত করা : ইসলামি সমাজের প্রতিটি সদস্য উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে, রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর অনুসারী হবে। আবার এটি সামষ্টিক ইবাদতও; যার লক্ষ্য আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর নবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

'উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।'[৮]

«اِثْنَتَانِ لَا تَقْرَبْهُمَا : اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْإِضْرَارُ بِالنَّاسِ»

'দুটি জিনিসের কাছে যেয়ো না : আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও মানুষের ক্ষতিসাধন।'[৯]

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

---

৭. সুরা আল-কলাম, ৬৮ : ৪।

৮. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ২০৭৮২, মুসনাদু আহমাদ : ৮৯৫২। হাদিসের মান : সহিহ।

৯. এই হাদিসটি শাইখ আলবানি ﵀ তাঁর সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফাহ ওয়াল মাওজুআহ গ্রন্থে নকল করে বলেন, এই শব্দে হাদিসটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু হাদিসের কোনো কিতাবে এই হাদিসটি আমি পাইনি। হয়তো এটির মূল ভিত্তি ইমাম গাজ্জালি ﵀ রচিত 'আল-ইহইয়া' গ্রন্থে বর্ণিত এই হাদিসটি : (خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: الشرك بالله والضر لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من البر: الإيمان بالله، والنفع لعباد الله)। 'আল-ইহইয়ার' এই হাদিসটির কোনো ভিত্তি নেই। হাফিজ ইরাকি ও সুবকি ﵀ ও হাদিসটির কোনো সনদ নেই বলেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জায়িফাহ ওয়াল মাওজুআহ : ১/৬৩)। হাদিসটির অর্থে কোনো সমস্যা নেই। তবে অর্থ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হলেও এটিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মানসুব করা যাবে না।

'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'[১০]

ইসলামের উন্নত নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিটি মুসলিমের অনুভূতিতে একজন প্রহরী হিসেবে কাজ করে; তার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করে। তাই তো (বিচারের অভাবে) সাইয়িদুনা আবু বকর ও উমর ফারুক ﷺ-এর আদালতের কার্যক্রম স্থগিত ছিল—যতদিন মানুষ ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ছিল।[১১] ইসলাম তার উন্নত নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রসার ঘটিয়ে মানবতার সেই পরম লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দান করে, যার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে স্বপ্ন দেখেছে, চেষ্টা-সাধনা করেছে, নিষ্ফল হাত-পা ছুড়েছে—একটি পরিশুদ্ধ জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন... একটি উন্নত জনপদের স্বপ্ন...

প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার কর্ণধাররা নগর ও দেশ পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করেছে অসংখ্য বিধি-নিষেধমূলক আইন; যেগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য নিযুক্ত আছে পুলিশ, প্রহরী ও প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু যার ভেতরে বিবেকতাড়িত আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই, এসব আইন-কানুন তাকে কখনো অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে না। বিবেকই মানুষকে সৎকাজের প্রেরণা জোগায় এবং অসৎ কাজ থেকে দূরে রাখে।

আধুনিক যুগ যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে; এমনকি চাঁদে পৌঁছতেও সক্ষম হয়েছে; কিন্তু ব্যক্তিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাই মানুষ এখনো মানবিক পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। কারণ আধুনিক এই সভ্যতা মানুষের বাহিক্য সমৃদ্ধি ও বস্তুগত জীবনের উন্নতির দিকে তার সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে; পক্ষান্তরে ইসলাম যুগপৎ মানুষের

---

১০. সহিহুল বুখারি : ১৩, সহিহু মুসলিম : ৪৫।

১১. বর্ণিত আছে, সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর খিলাফতকালে সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ কাজি নিযুক্ত হন। কিন্তু দীর্ঘ একটি বছর কেটে গেলেও তাঁর কাছে কোনো বিচারে আসেনি। তাই তিনি খলিফার কাছে গিয়ে কাজির পদ থেকে অব্যাহতি চান। এই গল্পটি সনদের বিচারেও যেমন বিশুদ্ধ নয়, তেমনই বাস্তবতার বিচারে সঠিক নয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন : shorturl.at/loDIP।

বাহ্যিক ও আত্মিক উৎকর্ষ এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সমান মনোযোগ দিয়েছে।

একবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিল্পোন্নত দেশের জনৈক প্রভাবশালী শিল্পপতি এক মুসলিম দায়িকে ইসলামের নৈতিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে দেখে। গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'মানুষের হৃদয়কে পবিত্র কীভাবে করতে হয়, তা আবিষ্কার করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আজ ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের দিকে আমরা কতই না মুখাপেক্ষী! কত দুর্ভাগা সেই মানুষ, যে পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে; কিন্তু নিজেকে করেছে কপর্দকশূন্য।'

প্রতিটি যুগের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ সর্বাবস্থায় ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধের মুখাপেক্ষী। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ নবি ও রাসুল; আর ইসলাম সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দ্বীন।

ইসলাম প্রতিটি মুসলিমকে তার ব্যক্তিজীবনে এবং মুসলিম উম্মাহকে তাদের সামষ্টিক জীবনে ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা ও অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছে—শান্তি ও যুদ্ধ সর্বাবস্থায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

একজন প্রকৃত মুসলিম চুরি করে না, মিথ্যা বলে না, খিয়ানত করে না, ধোঁকা দেয় না, ব্যভিচার করে না, পাপাচারে লিপ্ত হয় না, জুলুম করে না। তার বাইরের অবস্থা যেমন, ভেতরে অবস্থাও তেমন; ভেতরের অবস্থা যেমন, বাইরের অবস্থাও তেমন। সে বড়াই দেখায় না, অহংকার করে না, অবজ্ঞা করে না, দম্ভভরে বিচরণ করে না। সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। তার সম্পদে গরিব ও ভিক্ষুকদেরও একটি নির্দিষ্ট অংশ থাকে। উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে সে নির্দ্বিধায় নিজের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেয়।

একজন প্রকৃত মুসলিম অন্তরে ইসলামের সামরিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ লালন করে। সে কখনো শরয়ি নির্দেশনা অমান্য করে না; ধৈর্যশীল হয়, ভেঙে পড়ে না; বাহাদুর হয়, ভয় পায় না; দুঃসাহসী হয়, দ্বিধায় ভোগে না; অগ্রগামী হয়, পিছু হটে না; দৃঢ়পদ হয়, কম্পিত পদে চলে না; অধ্যবসায়ী হয়, হার মানে না। সে সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়ে—হককে প্রতিষ্ঠিত করতে, বাতিলকে মিটিয়ে দিতে।

মুসলিমরা লড়াই করে দাওয়াহর পথকে নিষ্কণ্টক করতে। তাঁরা কারও প্রতি জুলুম করে না। ইসলামের আকিদা, দ্বীনের মর্যাদা ও মুসলিম ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার জন্য তাঁরা যুদ্ধ করে। এই লড়াইকে তাঁরা নিজেদের সম্মান ও গৌরবের মুকুট মনে করে। তাই এ পথের যোদ্ধাদের জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ নয়, যেটি হক ও ইনসাফের পরিপন্থী—সত্য ও মহত্ত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাঁরা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকে। খিয়ানত ও প্রতারণা তাঁদের সঙ্গে যায় না। আহত, অসুস্থ ও বন্দীদের প্রতি তাঁরা সহমর্মিতা দেখায়; তাদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে। তাঁরা বেসামরিক লোকজনের কোনো ক্ষতি করে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কৃষক ও ধর্মযাজকদের ওপর হামলা করে না। বরং মানবজাতির সীমানা পেরিয়ে উদ্ভিদজগৎও পায় তাঁদের দয়া ও অনুগ্রহের নির্মল ছোঁয়াঃ তাঁরা কোনো ফলদার বৃক্ষ কাটে না। এমনকি প্রাণিজগৎও বঞ্চিত হয় না তাঁদের কল্যাণ থেকে : কেবল দুশমনের মালিকানাধীন বলে তাঁরা কোনো নিরীহ পশুকে কষ্ট দেয় না।

অনুরূপভাবে মুসলিমরা ইসলামের খুঁটিগুলো আল্লাহর জমিনে মজবুতভাবে পুঁতে দেওয়ার জন্যও লড়াই করে। কারণ ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম।[১২] আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾

'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির প্রতি আগ্রহী হোন এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করুন; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[১৩]

---

১২. অনেকে অজ্ঞতাবশত মনে করে, ইসলাম মানে শান্তি; অথচ (الإسلام) শব্দের অর্থ হলো : (الاستسلام) 'আত্মসমর্পণ করা', (الانقياد) 'অনুগত হওয়া'। আর শরিয়াহর পরিভাষায় ইসলাম হলো : (الاستسلام الله والانقياد لأوامره تعالى) 'আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করা।' লেখক এখানে ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম বলেছেন; কারণ ইসলাম পারতপক্ষে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। মুসলিম বাহিনী যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন মুসলিম সেনাপতি কাফিরদেরকে তিনটি প্রস্তাবের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে বলবে : ১. তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। অথবা ২. জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করো। এই দুটির কোনো একটিও যদি গ্রহণ না করো, তবে ৩. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। (সহিহু মুসলিম : ১৭৩১)

১৩. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬১।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে[১৪] প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[১৫]

তবে ইসলাম যে শান্তির কথা বলে, তা শক্তিশালী ইসলামি প্রশাসনের হাতে প্রতিষ্ঠিত শান্তি; দুর্বলদের নিরীহ শান্তি নয়। এই শান্তির অর্থ মানুষের কল্যাণ সাধন; শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এই অনুপম আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় এবং তাঁর অফাতের পরও ইসলামের বিজয়ের যুগে মুসলিমরা সংখ্যায় অতি অল্প হয়েও মুশরিক ও ইহুদিদের বড় বড় বাহিনীকে পরাজিত করেছে; এমনকি রোম ও পারস্যের মতো পরাশক্তির দম্ভও তারা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ইসলামের এই বিজয়ের যুগ ১১তম হিজরি থেকে ৯২তম হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়ের ধারাবাহিকতায় সময়ের এই স্বল্প পরিসরে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে চীন, পশ্চিমে ফ্রান্সের মধ্যভাগ; উত্তরে সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের এই বিজয় নিছক সামরিক বিজয় নয়; বরং এটি হলো ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের বিজয়। যখনই তারা বদলে গেল, তাঁদের আকিদা-বিশ্বাসে দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটল, তাদের বিজয়ের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। সময়ের পরিক্রমায় ক্রমশ দুর্বল হতে থাকল একসময়ের পরাক্রমশালী মুসলিম উম্মাহ, মর্যাদার সুউচ্চ পর্বতশিখর থেকে তাঁরা ছিটকে পড়ল লাঞ্ছনার অতল সাগরে।

---

১৪. এই আয়াতে বলা হয়েছে : (ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ) এখানে 'ইসলামকে (السِّلْمُ) বলা হয়েছে, যার অর্থও (الاستسلام) 'আত্মসমর্পণ' ও (الطاعة) 'আনুগত্য। কখনো (الصلح) 'সন্ধি' অর্থেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।' (তাফসিরুল বাইজাবি : ১/৩৩)

১৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২০৮।

তাদের বিজয় ইসলামের কারণেই হয়েছিল; সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই হয়েছিল। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলাম-নির্দেশিত জিহাদ ও কুরবানি ব্যতীত এই বিজয় কখনোই সম্ভব ছিল না।

ইসলামই আরবের প্রাণ; ইসলাম আছে তো আরব আছে—ইসলাম নেই তো আরবও নেই। ইসলামহীন আরব যেন অস্তিত্বহীন। আরবের দূরের ও কাছের ইতিহাস এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমাদের নেতা মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ, আমাদের পথপ্রদর্শক। আর তাঁর সাহাবিগণ আকাশের তারার মতো, তাঁদের যে কাউকেই আমরা অনুসরণ করব, হিদায়াত পাব।[১৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ উন্নত চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ, মুজাহিদগণের ইমাম এবং পুণ্যবানদের সর্দার।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা رضي الله عنها বলেন :

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।'[১৭]

ইসলামের বীর মুজাহিদ আলি বিন আবু তালিব رضي الله عنه বলেন :

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ، فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْقَوْمِ مِنْهُ

---

১৬. লোকমুখে প্রসিদ্ধ একটি হাদিস: (أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ) 'আমার সাহাবিরা তারার মতো, তাঁদের যে কাউকেই তোমরা অনুসরণ করবে, হিদায়াত পাবে।' এই হাদিসটি সহিহ নয়। কোনো মুহাদ্দিস এটিকে 'খুবই দুর্বল' বলেছেন; আবার কেউ মওজু বা জাল বলেছেন। ইমাম আহমাদ رحمه الله বলেছেন : (لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيْثُ) 'হাদিসটি সহিহ নয়'; ইমাম ইবনু হাজম رحمه الله বলেছেন : (بَاطِلٌ مَكْذُوْبٌ) 'বাতিল ও মিথ্যা।' শাইখ আলবানি হাদিসটিকে মওজু বলেছেন। হাদিসটি সনদ যেমন বিশুদ্ধ নয়, তেমনই এর মতনও বিশুদ্ধ নয়। তাই এই হাদিসটিকে রাসুলুল্লাহর দিকে মানসুব করা যাবে না। বিস্তারিত জানতে দেখুন : shorturl.at/flJ05।

১৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৬০১, সহিহু মুসলিম : ৭৪৬।

'যুদ্ধ যখন প্রবল আকার ধারণ করত, মুসলিম বাহিনী যখন দুশমনের মুখোমুখি হতো, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আশ্রয় নিতাম। আমাদের মধ্যে তিনিই দুশমনের সবচেয়ে কাছে থাকতেন।'[১৮]

তিনি আরও বলেন :

رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

'বদরের দিন আমরা নিজেদের রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আশ্রয় নিতে দেখেছি; আমাদের মধ্যে তিনিই দুশমনের সবচেয়ে কাছে ছিলেন; তিনিই সেদিন আক্রমণে সবার চেয়ে বেশি তীব্র ছিলেন।'[১৯]

সাহাবিদের কলব ও আকলের উর্বর জমিতে ইসলামি শিক্ষার বীজ রোপণ করার লক্ষ্যে তিনি নিজেই তাঁদের জন্য হয়ে উঠেছিলেন উত্তম আদর্শ। তাঁদেরকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এক কঠিন সাধনায়। সঠিক কাজের জন্য সঠিক লোক নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। তিনি যখন রফিকে আলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান, পৃথিবীতে রেখে যান একদল অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন সাহাবি, যাঁদের কেউ বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, কেউ দক্ষ প্রশাসক, কেউ প্রজ্ঞাবান আলিম, কেউ দূরদর্শী নেতা। তাঁর অবর্তমানে তাঁরই হাতে-গড়া এই মহান লোকেরাই উম্মাহকে সম্মান, কর্তৃত্ব ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে।

মাত্র সাত বছরে রাসুলুল্লাহ ﷺ ২৮টি যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব দেন। তাঁর সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল 'গাজওয়ায়ে ওয়াদ্দান'—যেটি দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে সংঘটিত হয়; আর সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল 'গাজওয়ায়ে তাবুক'—যেটি অষ্টম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে নয়টি যুদ্ধে মুশরিক বা ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই বাধে : বদর, উহুদ, খন্দক, বনু কুরাইজা, বনু

---

১৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৩৪৬। শাইখ আহমাদ শাকির রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।

১৯. মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৪। হাফিজ ইরাকি রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ জাইয়িদ বা উত্তম (তাখরিজুল ইহইয়া : ২/৪৬৭)

মুসতালিক, খাইবার, মক্কা, হুনাইন ও তায়িফ; বাকি ১৯টি যুদ্ধে মুশরিকরা লড়াই না করে পালিয়ে যায়।

চতুর্ভুজাকৃতির একটি কালো ঝান্ডার নিচে রাসুলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন; যার দৈর্ঘ্য একহাত এবং প্রস্থও একহাত; মাঝখানে একটি শাদা নতুন চাঁদ[২০], যার খোলা মুখটি বামদিকে তথা পতাকার উড়ন্ত অংশের দিকে মুখ করে।[২১] রাসুলুল্লাহ ﷺ এই ঝান্ডা উড়িয়েই মুসলিমদেরকে একের পর বিজয়ের দিকে পরিচালিত করেন। এই ঝান্ডাটিকে বলা হয় (الْعُقَابِ) বা 'ঈগল-নিশান।'[২২] কারণ ঈগল হলো সবচেয়ে তেজী, সাহসী ও মর্যাদাবান পাখি। আর মর্যাদা তো আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ ও মুমিনদের জন্যই।

বর্তমান সময়ে মুসলিমদের উচিত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা; ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং কালো পতাকার ছায়ায় পরিচালিত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় তাঁর অনুসৃত মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা; যাতে তাঁরা ফিরে পায় তাঁদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা; দুনিয়ার আসমানে যেন ফের সমুন্নত হয় ইসলামের শাশ্বত ঝান্ডা; মাসজিদুল আকসা ও ইসলামের পবিত্র ভূমিগুলো যেন পুনরায় চলে আসে তাঁদের হাতে।

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

---

২০. যেসব হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঝান্ডার বর্ণনা এসেছে, কোথাও নতুন চাঁদ থাকার কথা উল্লেখ নেই। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ পতাকায় চাঁদ অঙ্কিত ছিল বলার কোনো সুযোগ নেই। পতাকায় চাঁদ যুক্ত করেছেন পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকরা। সহিহ হাদিস থেকে এতটুকু জানা যায়, রাসুলুল্লাহর ঝান্ডা কালো ছিল, চতুর্ভুজ আকৃতির ছিল। এ ছাড়াও সাদা ও হলুদ ঝান্ডার কথাও এসেছে। তবে কালো ঝান্ডার হাদিসগুলো অধিক বিশুদ্ধ। যেসব হাদিসে ঝান্ডায় 'কালিমা' লেখা থাকার কথা এসেছে, সেগুলো সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, ফাতহুল বারি : ৬/১২৭।

২১. নতুন চাঁদের খোলা মুখটি পতাকার উড়ন্ত অংশের দিকে মুখ করে থাকবে। পতাকার একদিক তো একটি দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অপর দিকটি বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়; বাতাসে ছেড়ে দেওয়া দিককেই উড়ন্ত অংশ বলা হচ্ছে।

২২. রাসুলুল্লাহর ঝান্ডাকে (الْعُقَابِ) বা 'ঈগল' বলা হতো মর্মে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এগুলো দুর্বল হাদিস। তা ছাড়া আরবদের মাঝে যুদ্ধের ঝান্ডাকে (الْعُقَابِ) বা 'ঈগল' বলার প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল।

প্রথম অধ্যায়

নবিজীবনের মুঠো মুঠো সৌরভ

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (৬৮ : ৪)

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (৩৩ : ২১)

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম থেকে নবুওয়ত

রাসুলুল্লাহ ﷺ 'হস্তীর বছর'[২৩] ১২ রবিউল আওয়াল[২৪] সোমবার ভোরে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫]

তাঁর পিতার নাম : আব্দুল্লাহ।

বংশপরম্পরা : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদু মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কা'ব বিন লুআই বিন গালিব বিন ফিহ্‌র[২৬] বিন মালিক বিন নাজ্‌র বিন কিনানাহ বিন খুজাইমা বিন মুদরিকাহ বিন ইল্‌ইয়াস বিন মুজার বিন নিজার বিন মা'আদ্দ বিন আদ্‌নান।[২৭]

তাঁর মাতার নাম : আমিনা।

---

২৩. যে বছর ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা বাইতুল্লাহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার বিশাল হাতি-বহর নিয়ে হামলা করেছিল।

২৪. 'আর-রাহিকুল মাখতুম' গ্রন্থকার শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মতারিখ ৯ রবিউল আওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৫; দারু ইহইয়াইত তুরাস) সিরাতগবেষকদের মতে এই মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

২৫. খ্রিষ্টীয় বর্ষ অনুসারে এই দিনটি ছিল : ২০ এপ্রিল, ৫৭১ ইসায়ি। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৫; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

২৬. ফিহ্‌র-এর উপাধি হলো কুরাইশ। তাঁর নামেই কুরাইশ বংশের নামকরণ করা হয়। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৩৯; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

২৭. মূল বইয়ে 'নিজার' নামটি বাদ পড়েছিল; আমরা যুক্ত করে দিয়েছি। অনেক সময় পাঠক নামগুলোর সঠিক উচ্চারণ নিয়ে সংশয়ে ভোগেন। তাই আমরা এখানে আরবি হরকতসহ নসবনামাটি উদ্ধৃত করছি :

أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম থেকে নবুওয়ত

রাসুলুল্লাহ ﷺ 'হস্তীর বছর'[২৩] ১২ রবিউল আওয়াল[২৪] সোমবার ভোরে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫]

তাঁর পিতার নাম : আব্দুল্লাহ।

বংশপরম্পরা : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদু মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কা'ব বিন লুআই বিন গালিব বিন ফিহ্‌র[২৬] বিন মালিক বিন নাজ্‌র বিন কিনানাহ বিন খুজাইমা বিন মুদরিকাহ বিন ইল্‌ইয়াস বিন মুজার বিন নিজার বিন মা'আদ্দ বিন আদ্‌নান।[২৭]

তাঁর মাতার নাম : আমিনা।

---

২৩. যে বছর ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা বাইতুল্লাহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার বিশাল হাতি-বহর নিয়ে হামলা করেছিল।

২৪. 'আর-রাহিকুল মাখতুম' গ্রন্থকার শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি ؒ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মতারিখ ৯ রবিউল আওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৫; দারু ইহইয়াইত তুরাস) সিরাতগবেষকদের মতে এই মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

২৫. খ্রিষ্টীয় বর্ষ অনুসারে এই দিনটি ছিল : ২০ এপ্রিল, ৫৭১ ইসায়ি। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৫; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

২৬. ফিহ্‌র-এর উপাধি হলো কুরাইশ। তাঁর নামেই কুরাইশ বংশের নামকরণ করা হয়। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৩৯; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

২৭. মূল বইয়ে 'নিজার' নামটি বাদ পড়েছিল; আমরা যুক্ত করে দিয়েছি। অনেক সময় পাঠক নামগুলোর সঠিক উচ্চারণ নিয়ে সংশয়ে ভোগেন। তাই আমরা এখানে আরবি হরকতসহ নসবনামাটি উদ্ধৃত করছি :

أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

বংশপরম্পরা : মুহাম্মাদ বিন আমিনা বিনতু ওয়াহাব বিন আবদু মানাফ বিন জুহ্‌রা বিন কিলাব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা ও পিতার বংশপরম্পরা তাঁর ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ কিলাব পর্যন্ত গিয়ে এক হয়ে যায়।

ইসমাইল ﷺ-এর বংশধর থেকে আল্লাহ তাআলা কিনানাহকে নির্বাচন করেন। তারপর কিনানাহর বংশধর থেকে কুরাইশকে; কুরাইশ বংশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বেছে নেন।[২৮] তাই তাঁর বংশ মানবজাতির সবচেয়ে উত্তম বংশ এবং তাঁর পরিবার মানবজাতির সবচেয়ে উত্তম পরিবার।

রাসুলুল্লাহ ﷺ মায়ের গর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইনতিকাল করেন। মিরাস হিসেবে রেখে যান : পাঁচটি উট ও একজন বাঁদি।[২৯]

জন্মের কিছুদিন পর শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর দুধমা হালিমা সাদিয়াহর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৩০] আরবদের রীতি ছিল তারা শিশুদেরকে দুধ পান করানোর জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিত। যাতে গ্রামের নির্মল আবহাওয়ায় শিশুর শরীর সুস্থ ও পরিপুষ্ট হয়। শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে আনার পর থেকে হালিমা সাদিয়াহর ঘর বরকত ও কল্যাণে ভরে যায়। চার বছরেরও বেশি সময় তিনি হালিমার ঘরে ছিলেন।

তাঁর বয়স যখন ছয় বছর মা আমিনা তাঁকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় তাঁর মামাদের কাছে বেড়াতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে আবওয়া[৩১] নামক

---

২৮. সহিহু মুসলিম : ২২৭৬।

২৯. 'আর-রাহিকুল মাখতুম' গ্রন্থকার লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ পাঁচটি উট, একপাল বকরি এবং বারাকাহ নামে একজন হাবশি বাঁদি মিরাস হিসেবে রেখে যান। বারাকাহকে উম্মে আইমান নামে ডাকা হতো। তিনিই রাসুলুল্লাহকে লালনপালন করেন। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৪; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

৩০. শিশু মুহাম্মাদকে তাঁর মা আমিনার পর সর্বপ্রথম দুধ পান করান আবু লাহাবের বাঁদি সুআইবা। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৫; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

৩১. 'আবওয়া' মক্কা ও মদিনার মাঝে অবস্থিত একটি গ্রাম। এটি মক্কার চেয়ে মদিনার অধিক নিকটবর্তী।—লেখক।

স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাঁকে লালনপালন করেন পিতার রেখে যাওয়া বাঁদি উম্মে আইমান। ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। তিনি নাতির প্রতি এতটাই স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, এমন স্নেহ তার পুত্রদের বেলায়ও দেখা যায়নি।

দুই বছরের মাথায় তাঁর দাদাও চলে যান না ফেরার দেশে। এবার তাঁর দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব। তিনি বড়ই উদার ও অভিজাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। পরিবারের ভরণপোষণে তাকে রীতিমতো বেগ পেতে হতো।

শিশু মুহাম্মাদের বয়স যখন নয় বছর[৩২] চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ার প্রথম সফরে গমন করেন। বাণিজ্য-কাফেলা যখন সিরিয়ার বুসরা নামক জায়গায় পৌঁছয়, তাদের সঙ্গে বাহিরা[৩৩] নামক জনৈক খ্রিষ্টান পাদরির দেখা হয়।[৩৪] তিনি তাদের জানান, 'এই সময়ে আরবে একজন নবি আত্মপ্রকাশ করবেন; আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমনটিই বলা হয়েছে।' কাফেলার লোকেরা বলে, 'এখনো আরবে সেই নবি আত্মপ্রকাশ করেননি।...'[৩৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন বিশ বছর, ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৩৬] যুদ্ধের একপক্ষে ছিল কুরাইশ ও তাদের মিত্র কবিলাসমূহ এবং অপরপক্ষে ছিল কাইস

---

৩২. 'আর-রাহিকুল মাখতুম' গ্রন্থকার সিরিয়ার সফরের সময় তাঁর বয়স ১২ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৯; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

৩৩. অনেকেই এটিকে 'বুহাইরা' পড়েন। এটি ভুল। বিশুদ্ধ রূপ হলো 'বাহিরা।' ইমাম জাহাবি ও মাওয়াহিবের ব্যাখ্যাকারগণ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, (তাজুল আরুস, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ মুরতাজা আজ-জাবিদি : ১০/১২৯-১৩০)।

৩৪. বাহিরার আসল নাম জর্জিস। বাহিরা তার উপাধি। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৯; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

৩৫. পাদরি বাহিরার সঙ্গে আবু তালিবের কী কী কথা হয়েছিল, এই নিয়ে একাধিক বর্ণনা আছে। সুনানুত তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, পাদরি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে বলেন : (هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) 'এই শিশুটি বিশ্বজগতের সর্দার, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসুল; ওঁকে আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে আবির্ভূত করবেন।' (সুনানুত তিরমিজ : ৩৬২০)

৩৬. 'আর-রাহিকুল মাখতুম' গ্রন্থকার বলেছেন, ফিজার যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহর বয়স ছিল ১৫ বছর। (আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৯; দারু ইহইয়াইত তুরাস)

ও তাদের মিত্র কবিলাসমূহ। মক্কা ও তায়িফের মাঝে 'নাখলাহ' নামক জায়গায় এই লড়াই বাধে।

তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বছর, তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের পণ্যসম্ভার নিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বারের মতো সিরিয়া সফরে বের হন। খাদিজা তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। যুবক মুহাম্মাদের সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার খ্যাতি শুনে তিনি তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন। তরুণ বয়সেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা তাঁকে 'আল-আমিন' উপাধিতে ভূষিত করে।

সিরিয়ার এই সফরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খাদিজার গোলাম মাইসারাও ছিল। তাঁরা উভয়েই সিরিয়া গিয়ে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করেন এবং নতুন পণ্যসম্ভার ক্রয় করে মক্কায় ফেরেন। এই সফরে ব্যবসায় তাঁরা বিপুল পরিমাণে লাভবান হন।

সিরিয়া থেকে ফেরার দুই মাস পর যুবক মুহাম্মাদের সঙ্গে খাদিজার শাদি মুবারক সম্পন্ন হয়। খাদিজাই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, মক্কা নগরীর ওপর দিয়ে বয়ে যায় প্রলয়ংকারী বন্যার ঢল। কাবায় এমনিতেই একবার আগুন[৩৭] লেগেছিল; এবার বন্যার স্রোত গিয়ে আছড়ে পড়ে কাবার দেয়ালের ওপর। ফলে কাবাঘর সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাবা ভেঙে পুনরায় নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাবার নির্মাণ কাজে মুহাম্মাদ ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেন।

কাবাঘর পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পর কুরাইশ নেতাদের মাঝে 'হাজারে আসওয়াদ' স্থাপন নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়—কারা লাভ করবে এই বিরল সম্মান? মতবিরোধ থেকে লড়াইয়ের সূত্রপাত হওয়ার উপক্রম হয়। যুবক মুহাম্মাদ ﷺ এই জটিল সমস্যার সমাধান করেন। তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে বলেন, প্রতিটি গোত্র থেকে একজন লোক যেন এই চাদর ধরে। তারপর

৩৭. বন্যার তোড়ে কাবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এটি সিরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে এসেছে। কিন্তু এর পূর্বে আগুন লাগার বিষয়টি আমরা নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে পাইনি।

মুহাম্মাদ ﷺ নিজ হাতে সেই চাদরের মাঝখানে হাজারে আসওয়াদ রাখেন। গোত্রের সবাই মিলে চাদরে রাখা হাজারে আসওয়াদ বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যান। তারপর তিনি তাঁর মুবারক হাতে পাথরটি নির্ধারিত জায়গায় স্থাপন করেন।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে এত সম্পদ ছিল না যে তিনি উপার্জন না করে বসে থাকবেন। তাই কাজ করার বয়স হতে না হতেই তিনি তাঁর দুধভাইদের সঙ্গে গ্রামে বকরি চরাতেন। মক্কায় ফেরার পরও তিনি সামান্য মজুরির বিনিময়ে অন্যের ছাগল চরাতেন।[৩৮]

সংসারের অবস্থা একটু সচ্ছল হয়ে উঠলে তিনি আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন; মহান রবের শোকর ও প্রশংসায় নিমগ্ন হতেন। ইবাদতের অধিকাংশ সময় তাঁর কাটত হেরা গুহায়।

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা ﷺ-এর সঙ্গে শাদি হওয়ার পর তিনি বেশির ভাগ সময় হেরা গুহায় ইবাদতমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করতে থাকেন। কারণ খাদিজা ﷺ সম্পদশালী ছিলেন। তাই উপার্জনের কষ্ট তাঁর আর করতে হয়নি। এতে ইবাদতের জন্য তিনি দীর্ঘ অবসর পেয়ে যান।

৩৮. সহিহুল বুখারি : ২২৬২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবুওয়ত থেকে হিজরত

একসময় মুহাম্মাদ ﷺ মানুষের সংস্পর্শ ও কোলাহল ছেড়ে বেছে নেন নির্জনতা; সর্বান্তকরণে নিমগ্ন হন ইবাদত ও মুরাকাবায়।[৩৯] সর্বপ্রথম তাঁর জন্য যে দরোজা খোলে, তা হলো উত্তম স্বপ্নের দরোজা। তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। নিদ্রামগ্ন অবস্থায় দেখা তাঁর প্রতিটি স্বপ্নই ভোরের আলো ফোটার মতো সত্যে পরিণত হতে থাকে।

নির্জনে একান্ত সময় কাটানোর জন্য তিনি বেছে নেন হেরা গুহাকে। শুরুতে তিনি নির্দিষ্ট কিছু রাত সেখানে ইবাদত করতেন : কখনো দশ রাত; কখনো বা তার চেয়ে বেশি। এই সময়গুলোর জন্য তিনি সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাবারদাবার নিয়ে যেতেন। মজুদ ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজার কাছে ফিরে আসতেন। আবার সমপরিমাণ খাবার ইত্যাদি নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসে। কীভাবে তিনি গোটা মানবজাতিকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করবেন, তার নির্দেশনা নাজিল হতে শুরু হয়।

তিনি গোপনে দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু করেন। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه; নারীদের মধ্যে আম্মাজান খাদিজা رضي الله عنها আর বালকদের মধ্যে সাইয়িদুনা আলি বিন আবু তালিব رضي الله عنه।

যখন এই আয়াত নাজিল হলো : (فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ)[৪০] তখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। ফলে মক্কার

---

৩৯. মুরাকাবা মানে ধ্যান।

৪০. 'অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।' (সুরা হিজর, ১৫ : ৯৪)

মুশরিকরা তাঁকে নিদারুণ কষ্ট দিতে শুরু করে : তাঁর মুবারক শরীরে পাথর ছুড়ে মারে, ঘরের দরোজায় ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করে; তাদের বেয়াদবি এই পর্যন্ত পৌঁছয় যে, তারা প্রিয় নবির গলা পর্যন্ত টিপে ধরে এবং তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করে। বিশেষ করে তিনি যখন বাইতুল্লাহয় সালাত আদায় করতে যেতেন, তখন তারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত।

নবুওয়তের পঞ্চম বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে মুসলিমদের হাবশা হিজরত করার নির্দেশ দেন।

নবুওয়তের সপ্তম বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ চাচা আবু তালিব, বনু হাশিম, বনু মুত্তালিবের মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সকল লোকদের নিয়ে শিআবে[৪১] প্রবেশ করেন—কেবল পাপিষ্ঠ আবু লাহাব তাদের সঙ্গে ছিল না। মক্কার কাফিররা যখন দেখে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহর পরিধি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে, আরব কবিলাগুলোতে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তখন তারা রাসুলুল্লাহকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যে তারা সবাই মিলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে : যতদিন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য তাদের হাতে সোপর্দ না করবে, ততদিন তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে, তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা হবে না, তাদের সঙ্গে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না, লেনদেন হবে না, বিয়েশাদি হবে না, কথাবার্তা হবে না, তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা যাবে না। এই চুক্তির ধারাগুলো তারা বিস্তারিত লিখে কাবার ভেতরে ঝুলিয়ে দেয়। এই সর্বাত্মক বয়কটের ফলেই বাধ্য হয়ে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্র শিআবে আবু তালিবে প্রবেশ করে।

নবুওয়তের দশম বছর কুরাইশেরই কিছু লোক এই চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে দীর্ঘ তিন বছর পর এই অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সবাইকে নিয়ে শিআবে আবু তালিব থেকে বের হয়ে আসেন। এই দিনগুলো তাঁদের কেটেছিল দুঃস্বপ্নের মতো; সারা দিনমান দুমুঠো খাদ্যের জন্য চারদিকে হাহাকার। গোপনে যে অল্প কিছু খাবার আসত, তা মোটেও যথেষ্ট ছিল না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা গাছের পাতা পর্যন্ত চিবিয়েছেন।

---

৪১. শিআব মানে শিআবে আবু তালিব। পরে এটিকে শিআবে বনু হাশিমও বলা হতো। বর্তমানে এটিকে শিআবে আলি বলা হয়। এটি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম, যেখানে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

নবুওয়তের দশম বছর চাচা আবু তালিব ইনতিকাল করেন। তার প্রায় দুই মাস পর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাও পাড়ি জমান না ফেরার দেশে। আবু তালিব রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুশমনের অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতেন; তার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিতে কাফিরদের যথেষ্ট বেগ পেতে হতো।

আবু তালিবের মৃত্যুতে কাফিরদের একমাত্র বাধাটিও সরে যায়। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। তাদের এই ক্রমবর্ধমান জুলুম দেখে তিনি একবার তায়িফ যান, যেখানে বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা বাস করে—আপন গোত্রের লোকেরা ইমান না আনলেও হয়তো তারা ইমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এই আশায়। কিন্তু বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা তাঁর দাওয়াহকে কেবল নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে তাদের গোলাম ও এলাকার মূর্খ লোকদের লেলিয়ে দেয়—তারা তাঁকে গালাগাল দেয়, পাথর মেরে মেরে তাঁকে রক্তাক্ত করে, এমনকি রক্তে তাঁর জুতো পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

অবশেষে তায়িফ থেকে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। মুতয়িম বিন আদি তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

নবুওয়তের একাদশ বছর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইসরা ও মিরাজের মতো মহান নিয়ামত দান করেন। ইসরা হলো মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তিনের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাত্রিকালীন সফর। আর মিরাজ হলো ঊর্ধ্বজগতের সফর। এই রাতেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়।

কুরাইশদের ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ হজের উদ্দেশ্যে আগত বিভিন্ন কবিলার সমাবেশে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কোনো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে; আবার কোনো কোনো গোত্র বেশ বাজেভাবে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

হজের মৌসুমে তিনি যেসব আরব কবিলাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তার একটি হলো ইয়াসরিবের[৪২] খাজরাজ গোত্র।[৪৩] খাজরাজ গোত্রের ছয় জন লোকের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ কথা বলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখে তারা বুঝতে পারেন, আসমানি কিতাবগুলোতে শেষ নবির যে বৈশিষ্ট্যাবলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এই লোকটির মাঝে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।[৪৪] তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত পেয়ে তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা পরবর্তী বছর আবার রাসুলুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেন। এই ছয়জন লোক মদিনায় গিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন—মদিনার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় ইসলামের কথা।

পরবর্তী বছর[৪৫] হজের মৌসুমে ১২ জন লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে দশজন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের আর দুইজন আওস গোত্রের।[৪৬] তাঁরা একটি পাহাড়ের ঘাঁটির নিকট রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইমান আনেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু বিষয়ে বাইআত[৪৭] গ্রহণ করেন। এটিকে 'আকাবার[৪৮] প্রথম বাইআত' বলা হয়।

এই বাইআতের পর মদিনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াহ ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে আওস ও খাজরাজের ৭০ জন লোক রাতে সেই ঘাঁটির কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত হন। এটিকে 'আকাবার দ্বিতীয় বাইআত' বলা হয়।

---

৪২. ইয়াসরিব মদিনার পূর্বনাম। রাসুলুল্লাহর শুভাগমনের পর ইয়াসরিব হয়ে যায় মাদিনাতুর রাসুল বা রাসুলের শহর।—লেখক।

৪৩. এখানে মূলপাঠে ভুল ছিল। খাজরাজের জায়গায় আওস লেখা হয়েছিল। আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল খাজরাজ গোত্রের কিছু লোকের, আওস গোত্রের নয়। আমরা সিরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি দেখে বিষয়টি শুধরে দিয়েছি।

৪৪. খাজরাজ গোত্রের লোকেরা মদিনার ইহুদিদের কাছ থেকে শেষ নবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছিল।

৪৫. নবুওয়তের দ্বাদশ বছর।

৪৬. মূল কিতাবে ১০ জনকে আওস গোত্রের ও বাকি দুজন খাজরাজের বলা হয়েছে। এটি টাইপিস্টের ভুল। আমরা নির্ভরযোগ্য কতিপয় সিরাতগ্রন্থ পর্যালোচনা করে শুধরে দিয়েছি।

৪৭. রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছ থেকে এই মর্মে বাইআত ও প্রতিশ্রুতি নেন যে, তাঁরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং কোনো উত্তম বিষয়ে আমার অবাধ্য হবে না। (সহিহুল বুখারি : ৩৮৯২)

৪৮. আকাবা মানে ঘাঁটি। যেহেতু একটি পাহাড়ের ঘাঁটিতে এই বাইআত হয়েছিল, এটিকে আকাবার বাইআত বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসুল এলেন মদিনায়

মদিনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ সকল মুসলিমকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। কারণ মক্কায় তাঁদের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল। কুরাইশদের বাধার ভয়ে তাঁরা গোপনে মদিনায় পালিয়ে যেতে থাকেন। মক্কাতে কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিমই অবশিষ্ট থাকেন।

কুরাইশের কাফিররা যখন মুসলিমদের হিজরতের ব্যাপারে জানতে পারে, বিশেষ করে রাসুলুল্লাহর হিজরতের বিষয়টি আঁচ করতে পারে, তাঁকে হত্যা করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে। এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিটি গোত্র থেকে তারা একজন করে যুবক নেয়, যাতে হত্যার দায়ভার সকল গোত্রের ওপর বর্তায়।[৪৯] আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুশমনদের এই চক্রান্ত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে মদিনা হিজরত করারও নির্দেশ দেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه একসঙ্গে মদিনার উদ্দেশে সফর করার কথা আগে থেকেই পাকা করা ছিল। যে রাতে তিনি রওনা হচ্ছেন, সেই রাতেই কাফিররা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। সশস্ত্র মুশরিক যুবকরা তাঁর ঘর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু তিনি যখন ঘর থেকে বের হন, আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে ঘুম নামিয়ে দেন। তাই তারা কিছুই দেখতে পায়নি। ঘরে তিনি আলি رضي الله عنه-কে রেখে যান, যাতে মক্কার লোকদের তাঁর কাছে রাখা আমানতগুলো ফিরিয়ে দিতে পারেন।

---

৪৯. হত্যার দায়ভার সব গোত্রের ওপর বর্তালে বনু হাশিম একা এতগুলো গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না।

ঘর থেকে বের হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আবু বকরের বাড়ি যান। তারপর আবু বকরকে নিয়ে দ্রুত সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

মক্কার কাফিররা যখন বুঝতে পারে, তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে, তারা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে; চারদিকে লোক পাঠিয়ে দেয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর খোঁজে। তারা ঘোষণা করে, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে এনে দিতে পারবে কিংবা মুহাম্মাদের সন্ধান দিতে পারবে, তাকে একশ উট পুরস্কার দেওয়া হবে।' তারা মদিনার পথে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করে দেয়। কিছু লোক খুঁজতে খুঁজতে গারে সওরের মুখে চলে আসে, যেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তারাও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধান পেতে ব্যর্থ হয়।

আত্মগোপনের তৃতীয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি উট নিয়ে তাঁদের কাছে একজন রাহবার[৫০] আসে। এবার উটে চড়ে তাঁরা মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করেন। রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ সোমবার তাঁরা কুবায় পৌছেন।[৫১] এই সময় থেকেই হিজরি বর্ষ গণনা করা হয়। মুহাররম মাসকে হিজরি বর্ষের প্রথম মাস হিসেবে ধরা হয়।[৫২] দীর্ঘ ১৩ বছরের দমন-নিপীড়নের পর এটিই ছিল সমহিমায় ইসলামের আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন।

হিজরত নবিদের সুন্নাহ। কারণ প্রায় সব নবিকেই আপন জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। এই হিজরতের মধ্য দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্যান্য নবি-ভাইদের সুন্নাহ আদায় করেন।[৫৩]

---

৫০. রাহবার মানে গাইড বা পথপ্রদর্শক।

৫১. 'আর-রাহিকুল মাখতুম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ কুবায় পৌছেন নবুওয়তের চতুর্দশ বছর ৮ রবিউল আওয়াল সোমবার।

৫২. হিজরি বর্ষের প্রবর্তন করেন সাইয়িদুনা উমর ﷺ।

৫৩. এই জায়গায় মূল কিতাবের মাফহুমে ঈষৎ সংশোধনী আনা হয়েছে। কারণ সেখানে বলা হয়েছে, এমন কোনো নবি নেই, যিনি জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করেননি। এটি সত্য যে, নবি-রাসুলদের এক বড় অংশ হিজরত করেছেন। কিন্তু সব নবিই হিজরত করেছেন, এই দাবি করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। প্রথমত সর্বমোট কতজন নবি আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন, তাও আমাদের নিশ্চিতরূপে জানা নেই। দ্বিতীয়ত যেসব নবি-রাসুলের কথা কুরআনুল কারিম ও সহিহ হাদিসে এসেছে, তাঁদের প্রত্যেকেই হিজরত করেছেন, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলার মতো দলিলও পাওয়া যায় না। কারণ অনেক নবির জীবনীর ব্যাপারে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়।

কুবায় যাত্রাবিরতির সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর।'[৫৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর পুনরায় মদিনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। শহরের উপকণ্ঠে আনসারি সাহাবিরা তাঁকে বিপুল আগ্রহে স্বাগত জানান। মদিনার শিশু-কিশোর-তরুণ-বৃদ্ধ সবাই প্রবল উচ্ছ্বাসে ছুটে আসে তাঁকে একনজর দেখার জন্য। উল্লসিত আনসারি শিশুরা সমস্বরে গেয়ে ওঠে :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا — مَا دَعَى لِلّٰهِ دَاعْ
أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا — جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعْ

'আমাদের আকাশে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ—দক্ষিণের 'ওয়াদা'[৫৫] পাহাড় থেকে। কী উত্তম দ্বীন ও কী উত্তম শিক্ষা! আমাদের জন্য তো শোকর করা অত্যাবশ্যক। হে আমাদের কাছে প্রেরিত নবি, আপনার প্রতিটি হুকুম আমাদের শিরোধার্য।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই হিজরতের অর্থ দাঁড়ায় : একজন সেনাপতি তাঁর সৈনিকদের সঙ্গে নিরাপদ ঘাঁটিতে একত্রিত হলেন।

এই হিজরতের মধ্য দিয়ে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। সুতরাং এই রাষ্ট্রের ইতিহাস হিজরতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

---

৫৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৮।

৫৫. ওয়াদা মদিনার নিকটবর্তী একটি টিলার নাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই টিলার পাশ দিয়ে মদিনায় আগমন করেছিলেন। মদিনাবাসীরা তাদের প্রিয়জনদের বিদায় দিতে এই টিলা পর্যন্ত আসতেন। এই জন্যই টিলাটি প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনা অবস্থানের ফলে খুব দ্রুতই মদিনার কর্তৃত্ব তাঁকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে; তিনি মুসলিমদের প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

হিজরতের প্রথম বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববি নির্মাণ করেন। মুসলিমদেরকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে তিনি সশরীরে নির্মাণ কাজে অংশ নেন। এই বছরই আজানের বিধান নাজিল হয়, যাতে সালাতের সময় হলে মুসল্লিরা যথাসময়ে মসজিদে সমবেত হতে পারে।

এই মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রথম ছাউনি স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়। এটি ছিল একাধারে ইবাদতের স্থান, ইলমের পাঠশালা, প্রশাসনিক আদালত, আত্মার ব্যাধি নিরাময় হাসপাতাল আর সাহাবিদের মিলনায়তন।

ইহুদিরা যখন দেখে, মদিনায় ইসলাম দ্রুত শিকড় গেঁড়ে বসছে, তাদের অন্তরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন; তারা দ্রুত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে এই মর্মে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তারা রাসুলুল্লাহকে কষ্ট দেবে না এবং তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের সঙ্গে গাদ্দারি করে, তাঁদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধানোর প্রতিটি সুযোগকেই তারা কাজে লাগায়।

জিহাদের নির্দেশ দিয়ে সর্বপ্রথম এই আয়াতটি নাজিল হয় :

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ﴾

'যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো; কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের রব আল্লাহ।"'[৫৬]

---

৫৬. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৩৯-৪০।

তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর মদিনা আগমনের দ্বাদশ মাসের মাথায় লড়াইয়ের জন্য বের হন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে কার্যত ইসলামের জিহাদ শুরু হয়।

দ্বিতীয় হিজরিতে বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়। এই বছর শাবান মাসে রমাজানের সাওম ফরজ হয়। ইতিপূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিনটি সাওম পালন করতেন। সিয়ামের[৫৭] পর আল্লাহ তাআলা সাদাকাতুল ফিতরের বিধান নাজিল করেন।[৫৮]

দ্বিতীয় হিজরিতেই আল্লাহ তাআলা ধনীদের ওপর জাকাত ফরজ করেন। সমাজ থেকে দারিদ্র্য-বিমোচন এবং গরিব, মিসকিন, এতিম ও অসহায়দের প্রয়োজন পূরণে জাকাতব্যবস্থার বিকল্প নেই।

এই বছরই সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ। এটি ছিল ইতিহাসের এক ফায়সালাকারী লড়াই। এই অসম যুদ্ধে বাতিলের বিরুদ্ধে হক বিজয়ী হয়; মুমিনদের ক্ষুদ্র দল মুশরিকদের বৃহৎ দলকে পরাভূত করে।

এই বছরই সর্বপ্রথম ইদের সালাত আদায় করা হয়। ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ সমবেত সাহাবিদের নিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। সালাতশেষে খুতবা দিতেন; খুতবায় মুসলিমসমাজকে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিতেন এবং সব ধরনের বিভক্তি ও দলাদলির ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন, 'সকল মুসলিমই সমান, কোনো অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'[৫৯]

---

৫৭. সিয়াম শব্দটি সাওম শব্দের বহুবচন। সাওম মানে রোজা।

৫৮. এই জায়গায় লেখক বলেন, 'সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করলে রমাজানের সাওম কবুল হবে না।' কথাটি সঠিক নয়। তাই আমরা বাক্যটি বাদ দিয়েছি। সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করলে রমাজানের সিয়াম কবুল হবে না মর্মে একটি হাদিস এসেছে : (شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ إِلَى اللهِ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ) 'রমাজান মাস আসমান-জমিনের মাঝে ঝুলে থাকে, আল্লাহর কাছে ওঠানো হয় না, যতক্ষণ না সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা হয়।' এই হাদিসটিকে ইমাম সুয়ুতি জয়িফ বলেছেন। ইবনুল জাওজি 'আল-ওয়াহিয়াত' গ্রন্থে বলেছেন, হাদিসটি সহিহ নয়। শাইখ আলবানি ﷺ হাদিসটিকে তাঁর 'সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফায়' উল্লেখ করে বলেছেন, সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করলে রমাজানের সিয়াম কবুল হবে না, এমন কথা কোনো আহলে ইলম বলেছেন বলে আমি জানি না।

৫৯. লেখক এই জায়গায় আরও বলেছেন, (তারপর মুসলিমরা পরম ভালোবাসায় একে অপরের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন এবং সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য বের হতেন। ইদুল ফিতরের সাদাকা হলো

এই বছর আলি বিন আবু তালিব ﷺ-এর সঙ্গে নবি-তনয়া ফাতিমাতুজ জাহরা ﷺ-এর শাদি মুবারক সম্পন্ন হয়। তখন আলির বয়স ছিল ২১ বছর আর ফাতিমার ১৫ বছর। আলি-ফাতিমা দম্পতি থেকেই রাসুলুল্লাহর বংশধারা জারি হয়।

এই বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ-কে ঘরে তুলেন।

তৃতীয় হিজরিতে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিরন্দাজ সাহাবির একটি দল সেনাপতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে শত্রুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কৌশলগত বিজয় লাভ করে। এই লড়াইয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা সাইয়িদুনা হামজা ﷺ-সহ সত্তর জন আনসার ও মুহাজির সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। অল্প কয়েকজন সাহাবি নিয়ে যদি সেনাপতি রাসুলুল্লাহ ﷺ ময়দানে অবিচল না থাকতেন, তবে কাফিররা মুসলিমদের ধ্বংস করে দিত। এই যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে আঘাত লাগে এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়।

এই বছরের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ হাফসা বিনতে উমর এবং জাইনাব বিনতে খুজাইমা ﷺ-কে শাদি করেন।

- সাইয়িদুনা হাসান বিন আলি ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।

- সাইয়িদুনা উসমান বিন আফফান ﷺ-এর সঙ্গে নবি-তনয়া উম্মে কুলসুম ﷺ-এর শাদি মুবারক সম্পন্ন হয়। ইতিপূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেক কন্যা রুকাইয়া ﷺ-ও তাঁর বিবাহবন্ধনে ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুই দুইটি কন্যার স্বামী হওয়ার বিরল সৌভাগ্যের জন্য তাঁকে 'জুন্নুরাইন' বা 'জোড়া আলোকধারী' বলা হয়।

সাদাকাতুল ফিতর এবং ইদুল আজহার সাদাকা হলো কুরবানি।) সাহাবিগণ ইদের সালাতের পর পরস্পর মুসাফাহা করতেন এই মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। আর সাদাকাতুল ফিতর ইদগাহে রওনা হওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া সুন্নাহ। সহিহুল বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, সাহাবিরা ইদের এক বা দুই দিন আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে দিতেন। (সহিহুল বুখারি : ১৫১১) কথাগুলো আমরা টীকায় নিয়ে এসেছি, যাতে পাঠকরা ভুল না বোঝেন।

• মদ হারাম হওয়ার বিধান নাজিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদ হারাম ছিল না। ধাপে ধাপে এটিকে হারাম ঘোষণা করা হয়।

হিজরতের চতুর্থ বছর ইহুদি গোত্র বনু নাজিরের বিরুদ্ধে মুসলিমদের লড়াই বাধে। মুসলিমরা তাদেরকে অবরোধ করে দেশত্যাগে বাধ্য করে।

এই বছরের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

• সালাতুল খাওফের বিধান নাজিল হয়।

• তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হয়।

• সাইয়িদুনা হুসাইন বিন আলি ﵄ জন্মগ্রহণ করেন।

• রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা ﵂-কে শাদি করেন।

• রাসুলুল্লাহ ﷺ জাইদ বিন সাবিত ﵁-কে ইহুদিদের লেখা শেখার নির্দেশ দেন, যাতে তিনি ইহুদিদের কাছে চিঠি পাঠাতে পারেন এবং তাদের পাঠানো চিঠি বুঝতে পারেন।

হিজরতের পঞ্চম বছর সংঘটিত হয় দুমাতুল জান্দাল, বনু মুসতালিক, খন্দক ও বনু কুরাইজার যুদ্ধ। এই বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর ফুফাতো বোন জাইনাব বিনতে জাহাশ ﵂-কে শাদি করেন। ইতিপূর্বে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম ও পালকপুত্র জাইদ বিন হারিসা ﵁-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। জাইদ ﵁ তাঁকে তালাক দেওয়ার পর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশেই এই বিয়ে হয়েছিল। আরবের লোকেরা পালকপুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মতো মনে করত; তাকে পালক পিতার সম্পদের ওয়ারিশ বানাত এবং অন্যরাও তার সম্পদের ওয়ারিশ হতো। মোটকথা তার সকল বিধিবিধান আসল পুত্রের মতোই ছিল। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আপন পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করে রাসুলুল্লাহ ﷺ এই প্রথা খণ্ডন করেন।

এই বছর রাসুলুল্লাহর স্ত্রীদের জন্য পর্দার আয়াত নাজিল হয়[৬০] এবং সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য হজ ফরজ হয়।

হিজরতের ষষ্ঠ বছর হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। এই সন্ধির প্রাক্কালেই অনুষ্ঠিত হয় বাইআতুর রিজওয়ান।[৬১] মুসলিমরা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করে মদিনায় ফিরে আসে।

এই বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি রূপার একটি মোহর তৈরি করেন, যাতে লেখা ছিল : (محمد رسول الله)। যাদের কাছে তিনি চিঠি পাঠান, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো :

- রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস। যার উপাধি কাইসার।
- বসরার শাসক।
- সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে নিযুক্ত দামেশকের শাসক হারিস বিন আবু শিমর আল-গাসসানি।
- কাইসারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত মিসরের গভর্নর মুকাওকিস।[৬২]
- হাবশার বাদশাহ নাজাশি।[৬৩]
- পারস্যের সম্রাট খুসরু পারভেজ। যার উপাধি কিসরা।[৬৪]
- বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির বিন সাবি।

---

৬০. পর্দার আয়াত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য নাজিল হলেও এর হুকুম সকল মুসলিম নারীর জন্যও প্রযোজ্য। তা ছাড়া কোনো কোনো আয়াতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের পাশাপাশি সরাসরি মুসলিম নারীদের পর্দার কথাও এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন : (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ) 'হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।' ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, পর্দার আয়াত কত হিজরিতে নাজিল হয়েছে এই ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে : কেউ তৃতীয় হিজরি, কেউ চতুর্থ হিজরি, আবার কেউ পঞ্চম হিজরির কথা বলেছেন। তবে অধিক নির্ভরযোগ্য মত হলো চতুর্থ হিজরি।

৬১. সন্ধি নিয়ে আলোচনার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ উসমান রা.-কে মক্কায় পাঠান। কুরাইশরা তাঁকে নজরবন্দি করে। কিন্তু চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমান রা.-কে কাফিররা শহিদ করে দিয়েছে। এই খবর পেয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ সবার কাছ থেকে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করেন যে, উসমান রা.-এর রক্তের বদলা না নেওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। এই বাইআতকে বাইআতুর রিজওয়ান বলা হয়।

৬২. তার আসল নাম জুরাইজ বিন মাত্তা। মুকাওকিস তার উপাধি।

৬৩. তাঁর আসল নাম আসহামাহ। নাজাশি তাঁর উপাধি।

৬৪. মূল বইয়ে পারস্যের সম্রাটের নাম নওশেরওয়া লেখা হয়েছে। এটি সঠিক নয়।

- ইয়ামামার বাদশাহ হাওজা বিন আলি।

সপ্তম হিজরিতে ইহুদি ও মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত হয় খাইবার যুদ্ধ। এতে মুসলিমরা বিজয় লাভ করে।

এই বছর 'উমরাতুল কাজা'[৬৫] আদায় করা হয়। মুশরিকরা মুসলিমদের মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার পর এই প্রথম তারা মক্কায় তিন দিন অবস্থান করে এবং উমরা আদায় করে।

অষ্টম হিজরিতে সংঘটিত হয় মুতার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জাইদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ শহিদ হন।

এই বছর মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে। নির্যাতিত নির্বাসিত মুসলিমরা ফের বিজয়ী বেশে বালাদুল আমিন মক্কায় প্রবেশ করে। এ ছাড়াও এই বছর হুনাইন ও তায়িফ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

নবম হিজরিতে পরিচালিত হয় তাবুক অভিযান। এটি ছিল মূলত ইসলামের মহান বিজয়ের প্রকাশ্য ঘোষণা, যার নেতৃত্ব ও পরিকল্পনায় ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ। এর পর থেকে শুরু হয় ইসলামের ধারাবাহিক বিজয়াভিযান।

এই বছর সাইয়িদুনা আবু বকর ﷺ মুসলিমদের নিয়ে হজ সম্পাদন করেন এবং বনু সাকিফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল এসে রাসুলুল্লাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

হিজরতের দশম বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ হজ সম্পাদন করেন। এটিকে বিদায় হজ বলা হয়। আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যেখানে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও ধারাসমূহ সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করেন। এই দিন নাজিল হয় :

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

---

৬৫. ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী উমরা আদায় না করে মুসলিমরা মদিনায় ফিরে গিয়েছিল। পরবর্তী বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরিতে তার কাজা আদায় করা হয়।

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[৬৬]

এই বছর আরবের নানান অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল একে একে মদিনায় এসে তাদের ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেয়।

হিজরতের একাদশ বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং উসামা বিন জাইদ ؓ-কে এর কমান্ডার মনোনীত করেন। উসামাকে বলা হতো হিব্বুর রাসুল এবং তাঁর পিতা জাইদ বিন হারিসাকেও বলা হতো হিব্বুর রাসুল। হিব্বুর রাসুল মানে রাসুলুল্লাহর প্রিয়জন। এই বাহিনীতে আবু বকর, উমর ফারুক, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ؓ প্রমুখের মতো অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবিও ছিলেন। কিন্তু এই বাহিনী রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় অভিযানে বের হতে পারেনি। সাইয়িদুনা আবু বকর ؓ-এর খিলাফতের সময় এই বাহিনী উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপানে যাত্রা করে।

কারণ এই বাহিনী প্রস্তুতির কাজ চলাকালীন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা খুবই বেড়ে যায়। রবিবার নাগাদ তাঁর শরীরের ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করে। রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ সোমবার তিনি রফিকে আলার ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমান চিরজীবনের পথে।[৬৭] পুরো জিন্দেগি তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন, সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন, দাওয়াহ ও জিহাদের পথে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সয়েছেন, রিসালাতের গুরুদায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করেছেন এবং তারপর উম্মতকে এতিম করে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে।

অফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَزَاهُ خَيْرَ مَا يُجْزَى بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ

---

৬৬. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৩।

৬৭. লেখক রাসুলুল্লাহর হিজরতের তারিখ ধরেছেন ১২ রবিউল আওয়াল। সেই হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অফাতের দিন হিজরতের দশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একনজরে সিরাতুন্নবি ﷺ

সময়	ঘটনা
২২ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ	হস্তীর বছর রবিউল আওয়াল মাসের নয় বা বারো তারিখ সোমবার ভোরে মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। শিশু মুহাম্মাদকে তাঁর মা আমিনার পর সর্বপ্রথম দুধ পান করান আবু লাহাবের বাঁদি সুআইবা। তার কিছুদিন পর তাঁকে বনু সা'দে দুধমা হালিমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
৪ বছর বয়সে	বনু সা'দে থাকা অবস্থায় শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর বক্ষ বিদারণের প্রথম ঘটনা ঘটে। এরপর তিনি মায়ের কাছে প্রতিপালিত হন।
৬ বছর বয়সে	মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'আবওয়া' নামক স্থানে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মমতাময়ী মা আমিনা ইনতিকাল করেন। তারপর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন।

৮ বছর বয়সে	মা আমিনার মৃত্যুর মাত্র দুই বছর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি রাসুলুল্লাহর প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন চাচা আবু তালিবের কাছে।
৯/১২ বছর বয়সে	চাচা আবু তালিবের সঙ্গে কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে গমন করেন। পথে পাদরি বাহিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।
২০ বছর বয়সে	যুবক মুহাম্মাদ ﷺ ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর কুরাইশের কতিপয় কবিলা হিলফুল ফুজুল গঠন করলে তিনি তাদের মৈত্রীচুক্তিতে উপস্থিত থাকেন।
২৫ বছর বয়সে	সিরিয়ার দ্বিতীয় বাণিজ্যিক সফরে গমন করেন। খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂-কে শাদি করেন।
৩৫ বছর বয়সে	বাইতুল্লাহর সংস্কারের সময় হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মাঝে চরম বিরোধ দেখা দেয়। যুবক মুহাম্মাদ ﷺ শান্তিপূর্ণ সমাধান দিয়ে একটি অনিবার্য সংঘাত থেকে তাদের রক্ষা করেন।

৪০ বছর বয়সে (নবুওয়তের প্রথম বছর)	১০ আগস্ট ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ﷺ হেরা গুহায় নবুওয়ত লাভে ধন্য হন। সময়টি ছিল রমাজানের ২১ তারিখ সোমবার। তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। এরপর টানা তিন বছর তিনি গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন। গোপন দাওয়াতের এই সময়গুলোতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।
নবুওয়তের ২য় বছর	রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়ার সঙ্গে উসমান বিন আফফানের আকদ সম্পন্ন হয়। সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه এবং কাতিবে ওহি জাইদ বিন সাবিত رضي الله عنه জন্মগ্রহণ করেন।
নবুওয়তের ৩য় বছর	প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু হয়।
নবুওয়তের ৪র্থ বছর	ইসলামের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কুরাইশরাও প্রবল উদ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বাধা দিতে থাকে। মুসলিমদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করতে শুরু করে। ওয়ারাকা বিন নাওফিল ইনতিকাল করেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা জন্মগ্রহণ করেন।
নবুওয়তের ৫ম বছর	সাইয়িদুনা জাফর رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করেন। রজব মাসে কুরাইশের ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন থেকে বাঁচতে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল হাবশা হিজরত করে। সাইয়িদা সুমাইয়া رضي الله عنها শাহাদাত বরণ করেন।

নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছর	রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমদের ওপর কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতন মারাত্মক আকার ধারণ করে। সাইয়িদুনা হামজা ও উমর رضي الله عنهما ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার অপচেষ্টা করে।
নবুওয়তের ৭ম বছর	কুরাইশ গোত্রগুলো বনু হাশিমকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। শিআবে আবু তালিবে বনু হাশিমের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অবরুদ্ধ জীবনের সূচনা হয়। অনাহারে অর্ধাহারে নিদারুণ কষ্টে কাটতে থাকে তাদের দিন।
নবুওয়তের ৮ম বছর	আওস ও খাজরাজের মাঝে বুআস যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
নবুওয়তের ১০ম বছর	নবুওয়তের দশম বছর কতিপয় কুরাইশ নেতার তৎপরতায় বয়কটের অবসান হয়। বনু হাশিম শিআবে আবু তালিব থেকে বেরিয়ে আসে। এই বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবু তালিব ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা رضي الله عنها ইনতিকাল করেন। এই বছর শাওয়াল মাসে তিনি উম্মুল মুমিনিন সাওদা رضي الله عنها-কে শাদি করেন এবং এই মাসেই তিনি তায়িফে দাওয়াতি সফর করেন। তায়িফবাসীরাও রাসুলুল্লাহর দাওয়াহ প্রত্যাখ্যান করে।

নবুওয়তের ১১তম বছর	এই বছর হজের মৌসুমে খাজরাজ গোত্রের ছয়জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর শাওয়াল মাসে রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ؓ-কে শাদি করেন।
নবুওয়তের ১২তম বছর	এই বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ইসরা ও মিরাজের নিয়ামত দান করা হয়। মিরাজের পূর্বে বক্ষ বিদারণের দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়। এই বছর হজের মৌসুমে আকাবার প্রথম বাইআত সম্পন্ন হয়। মদিনার ১২ জন লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত হন।
নবুওয়তের ১৩তম বছর বা হিজরি ১ম বর্ষ	এই বছর হজের মৌসুমে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত সম্পন্ন হয়। সফর মাসের ২৬ তারিখ কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্মিলিতভাবে হত্যার পরিকল্পনা করে। সফরের ২৭ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা হন। ১২ রবিউল আওয়াল ২৭ সেপ্টেম্বর জুমাআবার তিনি মদিনায় পৌঁছেন। এই বছরই মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববি নির্মিত হয় এবং আজানের বিধান নাজিল হয়। সাইয়িদুনা উসমান বিন মাজউন ؓ ইনতিকাল করেন। সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ؓ জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরি ২য় বর্ষ	লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। গাজওয়ায়ে আবওয়া, গাজওয়ায়ে বুয়াত, গাজওয়ায়ে সাফাওয়ান বা বদরে উলা, গাজওয়ায়ে জুল উশাইরা, গাজওয়ায়ে বদরে কুবরা, গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা, গাজওয়ায়ে সাওয়িক ও গাজওয়ায়ে বনু সালিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তৃতীয়বারের মতো হত্যার চেষ্টা করা হয়। বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবাকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়। সাওম ও জাকাত ফরজ হয়। সাইয়িদুনা আলি ও সাইয়িদা ফাতিমার বিয়ে সুসম্পন্ন হয়।
হিজরি ৩য় বর্ষ	গাজওয়ায়ে গাতফান, গাজওয়ায়ে বাহরান, গজওয়ায়ে উহুদ, গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ সংঘটিত হয়। এই বছরে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাফসা ও জাইনাব বিনতে খুজাইমা ؓ-কে শাদি করেন। হাসান বিন আলির জন্ম হয়। উসমান ؓ-এর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের শাদি হয়।
হিজরি ৪র্থ বর্ষ	রজি অভিযান, বিরে মাউনা ট্র্যাজেডি ও গাজওয়ায়ে বনু নাজির সংঘটিত হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা ؓ-কে শাদি করেন। উম্মুল মুমিনিন জাইনাব বিনতে খুজাইমা ইনতিকাল করেন। হুসাইন বিন আলি জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরি ৫ম র্বষ	গাজওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল, গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক, গাজওয়ায়ে আহজাব, গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা ইত্যাদি সংঘটিত হয়। বনু মুসতালিক অভিযান থেকে ফেরার পথে আয়িশা ﵂-এর ব্যাপারে অপবাদ রটানো হয়। জাইনাব বিনতে জাহাশ এবং জুয়াইরিয়া ﵄-এর সাথে রাসুলুল্লাহর শাদি মুবারক সম্পন্ন হয়।
হিজরি ৬ষ্ঠ বর্ষ	ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়। উম্মে হাবিবা ﵂-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ শাদি করেন।
হিজরি ৭ম বর্ষ	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণ করা হয়। গাজওয়ায়ে খাইবার, গাজওয়ায়ে ওয়াদিউল কুরা ও গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা ইত্যাদি সংঘটিত হয়। বকরির গোশতে বিষ মিশিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সাফিয়া ও মাইমুনা ﵄-এর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শাদি মুবারক সম্পন্ন হয়। উমরাতুল কাজা আদায় করা হয়।
হিজরি ৮ম বর্ষ	গাজওয়ায়ে মুতা, ফাতহে মক্কা, গাজওয়ায়ে হুনাইন ও গাজওয়ায়ে তায়িফ সংঘটিত হয়। রাসুলুল্লাহর দুই সন্তান জাইনাব ও ইবরাহিম ﵄ ইনতিকাল করেন।

হিজরি ৯ম বর্ষ	গাজওয়ায়ে তাবুক সংঘটিত হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করার ধারাবারিকতা শুরু হয়।
হিজরি ১০ম বর্ষ	রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ সম্পন্ন করেন।
হিজরি ১১তম বর্ষ	২৯ সফর সোমবার থেকে তাঁর মৃত্যু-অসুস্থতা শুরু হয়। ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার চাশতের সময় তিনি আপন রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ১৪ রবিউল আওয়াল বুধবার সাইয়িদা আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।
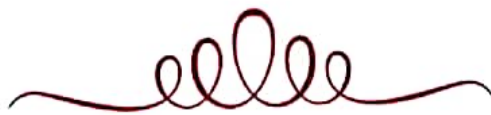
দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রিয় নবি ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে সুন্দর চেহারা এবং সবচেয়ে সুন্দর দৈহিক গঠনের অধিকারী; তিনি বেমানান দীর্ঘও নন, আবার খাটোও নন।' (সহিহুল বুখারি : ৩৫৪৯)

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني — وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ
خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ — كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

'আমার এই দু'নয়ন কভু দেখেনি তোমার চেয়ে সুদর্শন মানুষ; তোমার চেয়ে রূপবান সুপুরুষ জন্ম দেয়নি জগতের নারীকুল। সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র তুমি; যেন তুমি নিজেই বেছে নিয়েছ তোমার মনোহর এই রূপ।'

- হাস্সান বিন সাবিত رضي الله عنه

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য

সাইয়িদুনা বারা বিন আজিব ﷺ বলেন :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে সুন্দর চেহারা এবং সবচেয়ে সুন্দর দৈহিক গঠনের অধিকারী; তিনি বেমানান দীর্ঘও নন, আবার খাটোও নন।'[৬৮]

সাইয়িদুনা আবুত তুফাইল আমির বিন ওয়াসিলা ﷺ বলেন :

«كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ ফরসা লাবণ্যময়, মধ্যম গড়নের—(দীর্ঘও নন, আবার খাটোও নন; বেশি স্থূলকায়ও নন, আবার শীর্ণকায়ও নন।)'[৬৯]

আনাস বিন মালিক ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

«كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ، أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ، وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর মাঝারি গড়নের—লম্বাও না, আবার খাটোও না। গায়ের রং উজ্জ্বল ফরসা (শাদা-লালে মেশানো)—একেবারে ধবধবে সাদাও

---

৬৮. সহিহুল বুখারি : ৩৫৪৯।
৬৯. সহিহ মুসলিম : ২৩৪০।

নয়,[৭০] আবার একেবারে পাকা গমের রংও নয়। চুল সম্পূর্ণ কোঁকড়াও নয়, আবার পুরোপুরি সোজাও[৭১] নয়।'[৭২]

সাইয়িদুনা আনাস ﷺ বর্ণিত অপর একটি হাদিসে এসেছে :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً، وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ের রং উজ্জ্বল ফরসা। তাঁর ঘাম মুক্তোর মতো। হাঁটার সময় সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে চলেন। রাসুলুল্লাহ-এর হাতের তালুর চেয়ে কোমল কোনো মোলায়েম রেশমি কাপড়ও আমি দেখিনি। তাঁর শরীরের সুঘ্রাণের চেয়ে অধিক মনোহর কোনো মেশক কিংবা আম্বরও আমি শুঁকিনি।'[৭৩]

সাইয়িদুনা বারা বিন আজিব ﷺ বলেন :

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গড়ন মাঝারি; উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত; মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত; একবার তাঁকে আমি লাল বর্ণের জোড়া-চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখি। আমি তাঁর চেয়ে সুদর্শন কাউকে দেখিনি।'[৭৪]

---

৭০. অতিরিক্ত সাদা হলে শ্বেতরোগীদের মতো দেখায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ের রং এমন সাদা ছিল না।

৭১. বরং ঈষৎ ঢেউ খেলানো।

৭২. সহিহুল বুখারি : ৩৫৪৭।

৭৩. সহিহু মুসলিম : ২৩৩০।

৭৪. সহিহুল বুখারি : ৩৫৫১।

সাইয়িদুনা আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ، عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، هَدِبَ الْأَشْفَارِ، مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعُدٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা সুষম বড়; চোখজোড়া ডাগর ডাগর; ভ্রূগুলো দীর্ঘ। চোখে ঈষৎ লালিমা আছে। দাড়ি ঘন সন্নিবিষ্ট। গায়ের রং উজ্জ্বল ফরসা। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে হাঁটেন, যেন উঁচু জায়গা থেকে নামছেন; কারও দিকে ফিরলে পুরোটা ঘুরে সোজা তার মুখোমুখি হন।[৭৫] হাতের তালু ও পায়ের পাতা পুরু ও মাংসল।'[৭৬]

সাইয়িদুনা জাবির বিন সামুরা ﷺ বলেন :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ

'এক জোছনামুখর রাতে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখি। আমি একবার রাসুলুল্লাহর চেহারার দিকে তাকাই, আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাই। তাঁর গায়ে তখন লাল বর্ণের জোড়া-চাদর। আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর।'[৭৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সাইয়িদুনা আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন :

لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ،

---

৭৫. অর্থাৎ শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে কারও মুখোমুখি হন না। কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে কারও সঙ্গে কথা অহংকারের আলামত। রাসুলুল্লাহ ﷺ শুধু ঘাড় নয়; বরং সিনাসুদ্ধ ঘুরিয়ে সরাসরি মুখোমুখি হতেন।

৭৬. মুসনাদু আহমাদ : ৬৮৪। হাদিসটির মান হাসান।

৭৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৮১১।

وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ، وَالكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ، وَإِذَا التَفَتَ التَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর অতিরিক্ত লম্বাও না, আবার খুব বেশি খাটোও না; বরং স্বাভাবিক মানুষের মতো মাঝারি দৈর্ঘ্যের। তাঁর চুল একেবারে কোঁকড়ানোও না, আবার পুরোটা সোজাও না; বরং কিছুটা ঢেউ খেলানো। তিনি স্থূলকায়[৭৮] নন, আবার তাঁর চেহারাও একেবারে ফোলা গোলগাল নয়; বরং কিছুটা সুষম গোলাটে।[৭৯] গায়ের রং শাদা-লালে মেশানো উজ্জ্বল ফরসা। ডাগর ডাগর চোখগুলো ঘন কালো বর্ণের—চোখের পাপড়ির লোমগুলো দীর্ঘ। অস্থিসন্ধিগুলো[৮০] মোটা ও মজবুত; গ্রীবাসন্ধি[৮১] পুরু ও মাংসল। শরীরে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত লোম নেই।[৮২] সিনা থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত লোমের একটি সরু রেখা। হাতের তালু ও পায়ের পাতা পুরু ও মাংসল। যখন চলেন মাঝারি চালে ধীরে-সুস্থে পা ফেলেন, যেন নিচের দিকে নামছেন। কারও দিকে ফিরলে পুরোটা ঘুরে সোজা তার মুখোমুখি হন।[৮৩] উভয় কাঁধের মাঝখানে আছে নবুওয়তের মোহর। কারণ তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন।[৮৪] মানুষের মধ্যে তিনি সবার চেয়ে উদার; সবার চেয়ে

---

৭৮. স্থূলকায় মানে খুব বেশি মোটা।

৭৯. গোলাটে মানে খানিকটা গোল।

৮০. অস্থিসন্ধি মানে শরীরের বিভিন্ন জোড়ার হাড় যেমন কনুই, হাঁটু ইত্যাদি।

৮১. গ্রীবাসন্ধি মানে দুই কাঁধের সংযোগস্থল।

৮২. অনেক পুরুষের শরীর অতিরিক্ত লোমশ হয়। গোটা শরীর লোমে ভরা থাকে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর এমন ছিল না।

৮৩. অর্থাৎ শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে কারও মুখোমুখি হন না। কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে কারও সঙ্গে কথা অহংকারের আলামত। রাসুলুল্লাহ ﷺ শুধু ঘাড় নয়, বরং সিনাসুদ্ধ ঘুরিয়ে সরাসরি মুখোমুখি হতেন।

৮৪. খাতামুন নাবিয়্যিন মানে সর্বশেষ নবি, যার মাধ্যমে শেষ হয় নবুওয়তের ধারাবাহিকতা।

সত্যবাদী, সবার চেয়ে বিনয়-নম্র, সবার চেয়ে উত্তম সঙ্গী। তাঁকে হঠাৎ কেউ দেখলে তার হৃদয়ে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ভীতির সঞ্চার হয়;[৮৫] আর পরিচিত যারা তাঁর সাহচর্যে আসে, তারা তাঁকে ভালোবেসে ফেলে। তাঁর প্রশংসাকারী কেবল এতটুকু বলে, "তাঁর মতো কাউকে আমি কক্ষনো দেখিনি, না তাঁর অফাতের আগে, না তাঁর অফাতের পর।'"[৮৬]

সাইয়িদুনা হাসান বিন আলি ﵁ তাঁর মামা হিন্দ বিন আবু হালা ﵁ থেকে বর্ণনা করেন :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَظِيمَ الْهَامَةِ، رَجِلَ الشَّعْرِ، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، إِذَا هُوَ وَفْرَةٌ أَزْهَرُ اللَّوْنِ، وَاسِعُ الْجَبِينِ، أَزَجُّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ غَضَبٌ، أَقْنَى الْعِرْنِينَ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْنَبَ، مُفْلَجَ الْأَسْنَانِ، دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ، بَادِنَ مُتَمَاسِكَ سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضَ الصَّدْرِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ، أَنْوَرَ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ، يَجْرِي كَالْخَطِّ، عَارِيَ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ، طَوِيلَ الزَّنْدَيْنِ، رَحْبَ الرَّاحَةِ سَبْطَ الْقَصَبِ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلَ الْأَطْرَافِ، خُمْصَانَ الْأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحَ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قُلْعًا يَخْطُو تَكَفِّيًا وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ

---

৮৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পৌরুষদীপ্ত চেহারায় নুরের দীপ্তি এবং সর্বাঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের ঝংকারের কারণে তাঁকে হঠাৎ দেখলেই মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ভীতি সঞ্চারিত হয়।

৮৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৩৮।

جَمِيعًا خَافِضَ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ، يَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমলে। শরীর মাঝারি গড়নের লোকদের চেয়ে ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্তু একেবারে লম্বা মানুষের চেয়ে খাটো। মাথা সুষম বড়। চুল কিছুটা ঢেউ খেলানো। সহজেই চুলে সিঁথি হয়ে গেলে তিনি সিঁথি করে নেন;[৮৭] অন্যথায় ওয়াফরা[৮৮] রাখার সময় তাঁর চুল কানের লতি ছাড়িয়ে যায় না। শরীরের রং উজ্জ্বল শুভ্র লাবণ্যময়। ললাট[৮৯] প্রশস্ত। ভ্রূগুলো সরু, দীর্ঘ এবং পরিপূর্ণ প্রলম্বিত; তবে উভয় ভ্রূ মিলে যায়নি। উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটি শিরা আছে, রাগের সময় যেটি ফুলে ওঠে। নাক উত্তল[৯০]—সরু ও উন্নত; নাকের ওপর উন্নত আলোর ঈষৎ আভা; গভীরভাবে না দেখলে নাকের মধ্যভাগ উঁচু মনে হয়। দাড়ি ঘন সন্নিবিষ্ট। গণ্ডদ্বয় মসৃণ লাবণ্যময়। মুখমণ্ডল সুষম প্রশস্ত। দাঁত শুভ্র ঈষৎ ফাঁকা ফাঁকা। সিনা থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত লোমের একটি সূক্ষ্ম সরু রেখা। ঘাড় যেন স্বচ্ছ রৌপ্যের ন্যায় নকশাদার মুক্তো দিয়ে গড়া। শরীরের গড়ন সুষম ও মাঝারি। দেহকাঠামো মজবুত ও ছিমছাম; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত ও সুগঠিত। সিনা ও পেট সুষম সমান্তরাল। বুক চওড়া। উভয় কাঁধের মাঝে কিছুটা দূরত্ব আছে। অস্থিসন্ধিগুলো মোটা ও মাংসল। দেহের অনাবৃত অংশ[৯১] উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়। বুক ও নাভি লোমের একটি চিকন রেখা দ্বারা সংযুক্ত। বুক ও পেটে অতিরিক্ত লোম নেই। বাজু, সিনা ও কাঁধের উপরিভাগে পরিমিত লোম আছে। হাত ও পায়ের

৮৭. সহজে সিঁথি না হলে তিনি আপাতত ছেড়ে দিতেন। পরে কখনো চিরুনি ইত্যাদি হাতে এলে সিঁথি করে নিতেন।

৮৮. রাসুলুল্লাহ ﷺ তিন ধরনের চুল রাখতেন : ওয়াফরা, লিম্মা ও জুম্মা। ওয়াফরা মানে কানের লতি বরাবর চুল, লিম্মা মানে কানের লতি ও ঘাড়ের মাঝামাঝি বরাবর, আর জুম্মা মানে ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত। এই তিন ধরনের চুল রাখা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৮৯. ললাট মানে কপাল।

৯০. অর্ধবৃত্তাকার উন্নত উপরিভাগবিশিষ্ট।

৯১. শরীরের যেসব অংশ কাপড় বা চুল দ্বারা ঢাকা থাকে না। স্বাভাবিকভাবে অনাবৃত থাকে।

হাড় দীর্ঘ।[৯২] হাতের তালু প্রশস্ত। হাত-পায়ের হাড়গুলো সোজা ও মজবুত। আঙুলগুলো দীর্ঘ। পায়ের তলা খানিকটা গভীর। পা এতটা নিখুঁত ও মসৃণ যে পানির ফোঁটাও পিছলে যায়।[৯৩] যখন চলেন পা তুলে তুলে চলেন;[৯৪] লম্বা লম্বা পা ফেলে বড় গাম্ভীর্যের সঙ্গে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটেন—মনে হয় যেন কোনো উঁচু জায়গা থেকে নামছেন। কারও দিকে ফিরলে পুরোটা ঘুরে সোজা তার মুখোমুখি হন। দৃষ্টি অবনমিত রাখেন। আসমানের চেয়েও জমিনের দিকে বেশি তাকান। বেশিরভাগ সময় হালকা নজরে দেখেন।[৯৫] সাহাবিদেরকে আগে আগে হাঁটতে দেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে আগে সালাম দিয়ে দেন।[৯৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ 'জাদুল মাআদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, উম্মে মাবাদ ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ، أَبْلَجُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الْخَلْقِ، لَمْ تَعِبْهُ ثُجْلَةٌ، وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صُعْلَةٌ، وَسِيمٌ قَسِيمٌ، فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ، وَفِي صَوْتِهِ صَحَلٌ، وَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ، أَحْوَرُ، أَكْحَلُ، أَزَجُّ، أَقْرَنُ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، إِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ، أَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيبٍ، حُلْوُ الْمَنْطِقِ، فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ وَلَا هَذْرٌ، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ، رَبْعَةٌ، لَا تُقْحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ، وَلَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ، غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ، فَهُوَ أَنْضَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، إِذَا قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ، مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ، لَا عَابِسٌ وَلَا مُفْنِدٌ

৯২. হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশের হাড় এবং পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশের হাড় দীর্ঘ ছিল।

৯৩. পানির ফোঁটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, পিছলে যায়।

৯৪. মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে চলতেন না।

৯৫. সর্বদা সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন না।

৯৬. শুআবুল ইমান : ১৩৬২, আল-মুজামুল কাবির : ৪১৪। হাদিসটি সনদের বিচারে দুর্বল হলেও এর অর্থ বহু সহিহ হাদিস দ্বারা সমর্থিত।

'উজ্জ্বল ঝলমলে দেহাবয়ব, প্রদীপ্ত চেহারা, সুদর্শন গড়ন; ছিমছাম শরীর—দেহের ভার তাঁর ওপর চেপে বসেনি; মাথা মাঝারি আকারের—খর্বাকৃতির মাথা তাঁর সৌন্দর্য বিনষ্টের কারণ হয়নি। তিনি সুন্দর ও পরিপাটি। ডাগর ডাগর কালো দুটি চোখ; চোখের পাপড়ির লোমগুলো ঘন ও দীর্ঘ। ভরাট কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও কঠিন। উন্নত ঘাড়। শুভ্র নয়নে নিকষ-কালো মণি। ভ্রূগুলো সরু, দীর্ঘ ও সন্নিবিষ্ট। ঘন কালো চুল। যখন নীরব থাকেন, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গাম্ভীর্য আর যখন সরব হন, দীপ্তি ছড়ায় তাঁর বাকমাধুর্য। অনন্য সাধারণ সুন্দর পুরুষ। দূর থেকে দেখলে সুদর্শন আর কাছে এলে সুমধুর। সুমিষ্ট সুস্পষ্ট ভাষা; পরিমিত কথা—বাড়াবাড়ি যেমন নেই, ছাড়াছাড়িও নেই : মুখ থেকে যেন সুবিন্যস্ত মুক্তোদানার ন্যায় ঝরে পড়ে। দেহের গড়ন মাঝারি—কারও চোখে খাটোও মনে হবে না, আবার বেঢপ লম্বাও ঠেকবে না। বাকি দুই সাথির তুলনায় তিনি যেন গাছের দুই শাখার মাঝে এমন একটি শাখা, যেটি দেখতে অধিক সবুজ, সতেজ ও সুদর্শন। তাঁর সাথিরা তাঁকে বেষ্টন করে রাখে। তিনি যখন বলেন, তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শোনে; যখন হুকুম করেন, নিমিষেই পালন করে। তাঁরা সর্বদা তাঁর সেবায় তৎপর থাকে; সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকে। তিনি রূঢ় নন—বাচাল নন।'[৯৭]

তাঁর অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। বরং কেবল মুচকি হাসিই তিনি হাসতেন। সর্বোচ্চ এতটুকু হাসতেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যেত। হাসির কথায় কিংবা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক কথায় তিনি হাসতেন।[৯৮]

তাঁর কান্না ছিল হাসির মতোই মৌন। শব্দ নেই, আওয়াজ নেই। অট্টহাসি কিংবা ফুঁপিয়ে কান্না দুটো থেকেই তিনি ছিলেন অনেক দূরে। তবে তাঁর চোখের ধারা বেয়ে অশ্রু গড়াত। সিনা থেকে জাঁতা পেষার শব্দের মতো মৃদু কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেত।

---

৯৭. ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ কৃত জাদুল মাআদ : ৩/৫১।
৯৮. ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ কৃত জাদুল মাআদ : ১/১৮২।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো সাদা আবার কখনো কালো পাগড়ি পরতেন। হলুদ পাগড়ি পরার কথাও এসেছে।[৯৯] সাইয়িদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারি ﷺ বলেন :

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»

'মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।'[১০০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাদা কাপড় পরতে পছন্দ করতেন এবং সাহাবিদেরকেও সাদা কাপড় পরতে উৎসাহিত করতেন। সাইয়িদুনা সামুরা বিন জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ»

'তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো। তোমাদের জীবিতরা যেন সাদা কাপড় পরিধান করে এবং মৃতদেরও যেন সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়। কারণ সাদা কাপড় তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক।'[১০১]

---

৯৯. লেখক আনাস ﷺ-এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাগড়ি সাত হাত ছিল। এই হাদিসের কোনো ভিত্তি আমরা পাইনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাগড়ির দৈর্ঘ্য কতটুকু ছিল এই নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই এই হাদিসটি আমরা মূল পাঠে উল্লেখ করিনি। এ ছাড়াও পাগড়ি-বিষয়ক কথাগুলো আরও একটু পরিমার্জিত করা হয়েছে।

১০০. সহিহু মুসলিম : ১৩৫৮।

১০১. সুনানুন নাসায়ি : ৫৩২৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একনজরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য

▶ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গড়ন : রাসুলুল্লাহ ﷺ মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চেহারা এবং সবচেয়ে সুন্দর দৈহিক গঠনের অধিকারী। তাঁর শরীর বেঢপ লম্বাও না, আবার অতি খাটোও না। বরং মাঝারি গড়নের—যা অনেকটা লম্বার কাছাকাছি;[১০২] তবে লম্বা মানুষের সঙ্গে হাঁটার সময় তাঁকে সবার চেয়ে লম্বা দেখায়।[১০৩] দেহকাঠামো মজবুত ও ছিমছাম—বেশি মোটাসোটাও নয়; আবার একেবারে হালকা-পাতলাও নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত, সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত। সিনা ও পেট সুষম সমান্তরাল। অস্থিসন্ধিগুলো মোটা ও মাংসল।

▶ গায়ের রং ও ঘাম : উজ্জ্বল ফরসা। লাল ও শাদায় মেশানো। একেবারে শাদাও নয়; আবার পাকা গমের রংও নয়। ঘাম বিন্দু বিন্দু মুক্তো দানার মতো, যা সুঘ্রাণ আতরকেও হার মানায়। সাহাবিরা তাঁর ঘাম শিশিতে ভরে রাখতেন; আতর হিসেবে ব্যবহার করতেন।[১০৪]

▶ লোম : শরীরে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত লোম নেই।[১০৫] বুক ও নাভি লোমের একটি চিকন রেখা দ্বারা সংযুক্ত। বুক ও পেটেও অতিরিক্ত লোম নেই। বাজু, সিনা ও কাঁধের উপরিভাগে পরিমিত লোম আছে।

▶ মাথা : সুষম বড়। ক্ষুদ্রাকৃতিরও নয়, আবার অতিরিক্ত বড়ও নয়।

---

১০২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৭৫। হাদিসটির মান : হাসান।

১০৩. ফাতহুল বারি : ৬/৫৭১।

১০৪. সহিহু মুসলিম : ২৩৩১।

১০৫. অনেক পুরুষের শরীর অতিরিক্ত লোমশ হয়। গোটা শরীর লোমে ভরা থাকে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর এমন ছিল না।

- চুল : মাথাভর্তি ঘন কালো চুল।[১০৬]একেবারে কোঁকড়ানোও নয়, আবার পুরোটা সোজাও নয়; বরং ঈষৎ ঢেউ খেলানো। চুল কখনো কানের মাঝ বরাবর, কখনো কানের লতি বরবার, কখনো কান ও কাঁধের মাঝ বরাবর, আবার কখনো কাঁধ বরাবর দীর্ঘ হতো। হজ ও উমরার সময় মাথা মুণ্ডাতেন।[১০৭]

- চেহারা : সুষম গোলাটে ও প্রশস্ত; পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল—ঝলমলে দীপ্তিময়।

- কপাল : উজ্জ্বল ও প্রশস্ত।

- চোখ : ডাগর ডাগর। ঘন কালো বর্ণের। চোখের শুভ্রতার মধ্যে ঈষৎ লালিমা আছে।[১০৮] ভ্রূগুলো সরু এবং পরিপূর্ণ প্রলম্বিত; তবে উভয় ভ্রূ মিলে যায়নি। উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটি শিরা আছে, রাগের সময় যেটি ফুলে ওঠে। পাপড়ির লোমগুলো ঘন ও দীর্ঘ। দেখলে মনে হয়, তিনি চোখে সুরমা দিয়েছেন, অথচ তিনি সুরমা দেননি।[১০৯]

- নাক : নাক উত্তল[১১০]—সরু ও উন্নত; নাকের ওপর উন্নত আলোর ঈষৎ আভা; গভীরভাবে না দেখলে নাকের মধ্যভাগ উঁচু মনে হয়।

- গণ্ডদ্বয় : মসৃণ লাবণ্যময়।

- মুখ : সুষম বড় ও প্রশস্ত।[১১১]

- দাঁত : ধবধবে সাদা; সামনের দাঁতগুলো ঈষৎ ফাঁকা ফাঁকা।

- দাড়ি : পরিমাণে বেশি[১১২]—ঘন সন্নিবিষ্ট।

---

১০৬. মুসনাদু আহমাদ : ৯৪৪। হাদিসের মান : হাসান।
১০৭. ইমাম মুনাওয়ি ﷺ কৃত ফাইজুল কাদির : ৫/৭৪।
১০৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৪৬।
১০৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৪৫।
১১০. অর্ধবৃত্তাকার উন্নত উপরিভাগবিশিষ্ট।
১১১. সহিহু মুসলিম : ২৩৩৯।
১১২. সহিহু মুসলিম : ২৩৪৪।

▶ কাঁধ : মজবুত ও মাংসল। উভয় কাঁধের মাঝে দূরত্ব আছে।

▶ ঘাড় : মজবুত ও উজ্জ্বল—যেন স্বচ্ছ রৌপ্যের ন্যায় নকশাদার মুক্তো দিয়ে গড়া।

▶ বুক : চওড়া ও প্রশস্ত।

▶ হাত-পা : হাত ও পায়ের হাড় দীর্ঘ, সোজা ও মজবুত।[১১৩] হাতের তালু পুরু, মাংসল ও প্রশস্ত—রেশমের চেয়েও বেশি মোলায়েম। হাত বরফের চেয়েও ঠান্ডা এবং মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধযুক্ত।[১১৪] আঙুলগুলো দীর্ঘ। পায়ের তলা খানিকটা গভীর। পা এতটা নিখুঁত ও মসৃণ যে পানির ফোঁটাও পিছলে যায়।[১১৫] পায়ের পাতা পুরু ও মাংসল। পায়ের গোড়ালি ছোট।[১১৬]

▶ হাঁটার ধরন : তিনি মাঝারি চালে পা তুলে তুলে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটেন, যেন উঁচু জায়গা থেকে নামছেন।

▶ ব্যক্তিত্ব : মানুষের মধ্যে তিনি সবার চেয়ে উদার; সবার চেয়ে সত্যবাদী, সবার চেয়ে বিনয়-নম্র, সবার চেয়ে উত্তম সঙ্গী। তাঁকে হঠাৎ কেউ দেখলে তার হৃদয়ে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ভীতির সঞ্চার হয়;[১১৭] আর পরিচিত যারা তাঁর সাহচর্যে আসে, তারা তাঁকে ভালোবেসে ফেলে।

▶ পোশাক : সাদা পোশাক ভালোবাসেন। চাদর, জুব্বা, লুঙ্গি, পাগড়ি ইত্যাদি পরেন। কখনো লাল চাদরও পরিধান করেন।

---

১১৩. হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশের হাড় এবং পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশের হাড় দীর্ঘ ছিল।

১১৪. সহিহুল বুখারি : ৩৫৫৩।

১১৫. পানির ফোঁটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, পিছলে যায়।

১১৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৪৬।

১১৭. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পৌরুষদীপ্ত চেহারায় নুরের দীপ্তি এবং সর্বাঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের ঝংকারের কারণে তাঁকে হঠাৎ দেখলেই মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ভীতি সঞ্চারিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয় নবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (৬৮ : ৪)

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন।' (মুসনাদু আহমাদ : ২৪৬০১; সহিহু মুসলিম : ৭৪৬)

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

চারিত্রিক সৌন্দর্য

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন যাবতীয় সৎ গুণ ও শিষ্টাচারের আধার। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানরা যেসব মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, তার সবগুলোর সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রে। একজন আদর্শ বান্দা কেমন হবে, তার আল্লাহপ্রদত্ত নমুনা হলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন স্বয়ং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বলেন :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[১১৮]

কুরআনই ছিল রাসুলুল্লাহর চরিত্র।[১১৯] যে বিষয়ে কুরআন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তিনিও করতেন আর যে বিষয়ে কুরআন কঠোর হয়েছে, তিনিও হতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যারা দীর্ঘ সময় ধরে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাদের একজন হলেন সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ؓ। তিনি দীর্ঘ দশ বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেন। তিনি বলেন :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا»

---

১১৮. সুরা আল-কলাম, ৬৮ : ৪।
১১৯. সহিহ মুসলিম : ৭৪৬। আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত।

'রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের মানুষ।'[১২০]

অপর এক হাদিসে তিনি বলেন :

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: «فَخَدَمْتُهُ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আসেন, আবু তালহা আমার হাত ধরে আমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যান। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি বলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আনাস বুদ্ধিমান ছেলে; সে আপনার খিদমত করবে।" তারপর আমি ঘরে ও সফরে তাঁর খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম, কখনো এমন হয়নি যে, আমি কোনো কাজ করেছি, আর তিনি আমাকে বলেছেন, "এটি এভাবে কেন করেছ?" কিংবা আমি কোনো কাজ করিনি আর তিনি আমাকে বলেছেন, "এটি কেন এভাবে করনি?"'[১২১]

অন্য হাদিসে এসেছে, আনাস ﷺ দশ বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কোনো বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে 'উফ' পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।[১২২]

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ﷺ বলেন :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আমি রাসুলুল্লাহর চেয়ে উত্তম চরিত্রের কাউকে দেখিনি।'[১২৩]

---

১২০. সহিহু মুসলিম : ২৩১০।

১২১. সহিহুল বুখারি : ৬৯১১।

১২২. সহিহু মুসলিম : ২৩০৯।

১২৩. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৬৫৮০। ইবনে হাজার ﷺ বলেন, হাদিসটির সনদ হাসান। (ফাতহুল বারি : ৬/৫৭৫)

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﵂ বলেন :

«مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো বিষয়ে দুটি অপশনের একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে তিনি অবশ্যই সহজটি বেছে নিতেন—যদি সেটি কোনো গুনাহের বিষয় না হয়। কারণ গুনাহের বিষয় থেকে তিনি সর্বোচ্চ দূরে অবস্থান করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কোথাও আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত কোনো সীমা লঙ্ঘিত হলে তিনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।'[১২৪]

তিনি আরও বলেন :

«مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো নিজ হাতে কাউকে আঘাত করেননি—না কোনো স্ত্রীকে, না কোনো খাদিমকে; তবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কথা ভিন্ন। কেউ তাকে (কথায় বা কাজে) কষ্ট দিলে তিনি কখনো প্রতিশোধ নেননি; তবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সীমারেখা লঙ্ঘিত হলে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।'[১২৫]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

---

১২৪. সহিহুল বুখারি : ৩৫৬০।
১২৫. সহিহ মুসলিম : ২৩২৮।

«لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগতভাবেই অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ছিলেন; অসংলগ্ন বা অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। তিনি বাজারে গিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন না। মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দিতেন না। বরং ক্ষমা করে দিতেন।'[১২৬]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন :

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا، وَلَا فَحَّاشًا، وَلَا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ গালিগালাজকারী, অশ্লীলভাষী ও লানতকারী ছিলেন না। কাউকে তিরস্কার করার সময় শুধু বলতেন, 'তার কী হলো? তার কপাল ধূলিমলিন হোক।'[১২৭]

সিমাক বিন হারব কুফি ﷺ বলেন, একবার আমি সাইয়িদুনা জাবির বিন সামুরা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মজলিশে বসতেন?' তিনি উত্তর দেন :

«نَعَمْ، وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّحِكِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ عِنْدَهُ الشِّعْرَ، وَأَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِهِمْ، فَيَضْحَكُونَ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ»

'হাঁ, তিনি নীরব থাকতেন বেশি; হাসতেন কম। সাহাবিগণ তাঁর সামনে কবিতা বলতেন, নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাও করতেন এবং হাসাহাসি করতেন। তিনিও কখনো মুচকি হাসতেন।'[১২৮]

---

১২৬. সুনানুত তিরমিজি : ২০১৬, সহিহুল বুখারি : ৩৫৫৯, সহিহ মুসলিম : ২৩২১।
১২৭. সহিহুল বুখারি : ৬০৩১।
১২৮. মুসনাদু আহমাদ : ২০৮১০।

পরিবারের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করতেন। তিনি ইরশাদ করেন :

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম। আর আমি আপন পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।'[১২৯]

তিনি ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন। সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন :

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»

'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছু বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম করেন।'[১৩০]

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত অপর এক হাদিসে তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠান। আমি বলি, "আল্লাহর কসম, আমি যাব না।"[১৩১] কিন্তু আমার অন্তরে ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কাজে আমাকে পাঠাচ্ছেন আমি যাব। তারপর আমি বের হয়ে হাঁটতে থাকি। একসময় বাজারে খেলাধুলারত কিছু ছেলেদের পাশ দিয়ে যাই। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ পেছন থেকে আমার ঘাড় ধরেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। তিনি বলেন :

يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟

"আদরের আনাস, আমি যেখানে যেতে বলেছিলাম, তুমি কি সেখানে গিয়েছ?"

---

১২৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

১৩০. সহিহ মুসলিম : ২১৬৮।

১৩১. এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, আনাস رضي الله عنه কীভাবে প্রকাশ্যে রাসুলুল্লাহর হুকুম অমান্য করলেন এবং মিথ্যা কসম খেলেন? আবার রাসুলুল্লাহই বা কেন কসম করার পরও তাঁকে ওই কাজে পাঠালেন? এর উত্তরে বলা হবে, তিনি তখন ছোট ছিলেন। শরিয়তের আহকাম তার ওপর প্রযোজ্য ছিল না।—(আওনুল মাবুদ)

আমি বলি, "হাঁ, আমি যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসুল!"[১৩২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের অন্যতম মূলনীতি ছিল, কোমলতা। তিনি বলতেন :

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

"কোমলতার ছোঁয়ায় সবকিছু সুন্দর হয়ে ওঠে আর কোমলতার অভাবে কদর্য হয়ে পড়ে।""[১৩৩]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

'আল্লাহ তাআলা কোমল, তিনি কোমলতা ভালোবাসেন। কোমলতায় তিনি যে ফল দেন, তা কঠোরতা বা অন্য কিছুতে দেন না।'[১৩৪]

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ﴾

'আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠিনচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।'[১৩৫]

---

১৩২. সহিহু মুসলিম : ২৩১০।
১৩৩. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৪।
১৩৪. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৩।
১৩৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'একবার আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তখন তাঁর গায়ে মোটা পাড়ের একটি নাজরানি[১৩৬] চাদর ছিল। এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে চাদর ধরে হেঁচকা টান দেয়। আমি দেখি, এই প্রচণ্ড টানের ফলে তাঁর কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে চাদরের পাড়ের দাগ বসে যায়। তারপর সে বলে, "তোমার কাছে আল্লাহর যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দেন।'[১৩৭]

তুফাইল বিন আমর দাওসি ﷺ তাঁর সাথিদের নিয়ে[১৩৮] রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, দাওস গোত্রের লোকেরা নাফরমানি করেছে, দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ»

> "ইয়া আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন; তাদেরকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসুন।"'[১৩৯]

একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি গাধায় সওয়ার হন। গাধার পিঠে একটি ফাদাকি চাদরের[১৪০] ওপর একটি গদি ছিল। পেছনে উসামা বিন জাইদ ﷺ-কেও বসান। তিনি বনি হারিস বিন খাজরাজ গোত্রে সাদ বিন উবাদাহর অসুস্থতায় তাকে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটি বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথিমধ্যে তিনি একটি মজলিশের পাশ দিয়ে যান, যেখানে মুসলিম, মূর্তিপূজক মুশরিক এবং ইহুদি একত্রে বসা ছিল। তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ বিন উবাইও ছিল। মজলিশে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ-ও ছিলেন। গাধার খুরের ধুলোয় মজলিশ আচ্ছন্ন

---

১৩৬. 'নাজরান' সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ইয়ামানের সীমান্তবর্তী একটি প্রদেশ।

১৩৭. সহিহুল বুখারি : ৩১৪৯, সহিহু মুসলিম : ১০৫৭।

১৩৮. তুফাইল বিন আমর ﷺ-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ দাওস গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

১৩৯. সহিহুল বুখারি : ৪৩৯২।

১৪০. ফাদাকি চাদর মানে ফাদাক অঞ্চলে তৈরি চাদর। ফাদাক মদিনা থেকে দুই কি তিন মাইল দূরের একটি শহর।

হয়ে গেলে আব্দুল্লাহ বিন উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে নেয় এবং বলে ওঠে, 'আমাদের ওপর ধূলি উড়িয়ো না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের সালাম করেন। সেখানে থামেন। গাধা থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন। তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলে, 'হে লোক, তুমি যা বলছ, তা যদি সত্য হয়, তবে এর চেয়ে উত্তম কথা আর হতে পারে না। তবে আমাদের মজলিশে এসে আমাদের কষ্ট দিয়ো না। তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আমাদের মধ্য থেকে যারা তোমার কাছে যাবে, তাদেরকে তোমার এসব কথা শোনাও।' তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলে ওঠেন, 'আপনি আমাদের মজলিশে অবশ্যই আসবেন। কারণ আমরা এসব কথা পছন্দ করি।' ফলে মুসলিম, মুশরিক ও ইহুদির মাঝে বাকবিতণ্ডা ও গালাগাল শুরু হয়; এমনকি পরস্পরের ওপর চড়াও হওয়ার উপক্রম হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই গোলযোগ থামান। তারপর গাধায় চড়ে সাদ বিন উবাদাহর কাছে চলে যান এবং তাকে বলেন, 'সাদ, আবু হুবাব কী বলেছে শুনেছ?—তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইর কথা বলছিলেন—সে এমন এমন বলেছে।' তখন সাদ বিন উবাদাহ রা. বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন; তাকে উপেক্ষা করুন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা দেওয়ার দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে এই শহরের লোকজন নেতৃত্বের মুকুট ও পাগড়ি পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সত্য দান করেছেন তার কারণে যখন তিনি এটি হতে দিলেন না, সে হিংসায় জ্বলে উঠেছে। তাই সে আপনার সঙ্গে এমন আচরণ করেছে।' সব শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দেন।[১৪১]

আনাস বিন মালিক রা. বলেন, 'একবার মক্কার আশিজন সশস্ত্র লোক তানয়িম পাহাড় থেকে অতর্কিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর চড়াও হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের অসতর্কতার সুযোগকে কাজে লাগানো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বিনা যুদ্ধে বন্দী করে ফেলেন এবং জীবিত ছেড়ে দেন।[১৪২] তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন :

---

১৪১. সহিহ মুসলিম : ১৭৯৮, সহিহুল বুখারি : ৬২০৭।
১৪২. সহিহ মুসলিম : ১৮০৮।

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾

'তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন—তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[১৪৩]

দুনিয়ার কোনো স্বার্থ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে রাগান্বিত করত না। তবে হকের প্রশ্নে তিনি আপসহীন ছিলেন। যখন হকের সীমানা লঙ্ঘন করা হতো, তাঁর রাগের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারত না—যেকোনো মূল্যেই তিনি ব্যবস্থা নিতেন। তিনি নিজের জন্য রাগতেন না, নিজের জন্য প্রতিশোধও নিতেন না।

আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ গনিমত বণ্টনের সময় কিছু লোককে বেশি দেন। আকরা বিন হাবিসকে একশ উট দেন। উয়াইনাকেও সমপরিমাণ দেন। আরবের কিছু সম্ভ্রান্ত লোককেও গনিমতের মাল প্রদান করেন এবং বণ্টনে তাদের বেশি দেন। এক ব্যক্তি বলে, "আল্লাহর কসম, এই বণ্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এই বণ্টন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি।" আমি বলি, "আল্লাহর কসম, আমি রাসুলুল্লাহকে তোমার এই মন্তব্য জানাব।" তারপর আমি রাসুলুল্লাহর কাছে গিয়ে সব খুলে বলি। তিনি বলেন :

«فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ»

"স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই যদি ইনসাফ না করে, তবে কে আর করবে? আল্লাহ তাআলা মুসাকে রহম করুন; তাঁকে এর চেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। তবুও তিনি সবর করেছিলেন।"'[১৪৪]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করুন।' তিনি বলেন :

১৪৩. সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৪।
১৪৪. সহিহুল বুখারি : ৩১৫০।

«إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً»

'আমাকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়নি; আমাকে পাঠানো হয়েছে রহমত হিসেবে।'[১৪৫]

মক্কা বিজয়ের পর মুশরিক কুরাইশ সর্দাররা কাবা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়, তারা মনে মনে ভাবে, তাদের ঘাড়ে মৃত্যুর খড়গ ঝুলছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে কাবার কাছে আসেন এবং দরোজার উভয় চৌকাঠ ধরে বলেন :

مَا تَقُولُونَ وَمَا تَظُنُّونَ؟

'তোমাদের বক্তব্য কী? তোমাদের ধারণা কী?'

মক্কার নেতারা বলে, 'আপনি একজন মহান ভাই এবং একজন দয়াবান উদার চাচার ভাইপো।'

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি আজ তা-ই বলব, যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন :

﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ﴾

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।""[১৪৬]

এই ঘোষণা শোনার পর কুরাইশরা এমনভাবে বের হয়, যেন তাদেরকে কবর থেকে তোলা হয়েছে এবং তারা দলে দলে ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করে।[১৪৭]

---

১৪৫. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৯।

১৪৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯২।

১৪৭. শারহু মাআনিল আসার : ৫৪৫৪।

বিনয় ও নম্রতা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

'আর যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও।'[১৪৮]

অর্থাৎ তাদের প্রতি অমায়িক আচরণ করুন এবং নম্রতা প্রদর্শন করুন। আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে গরিব মুমিন ও অন্যান্যদের সঙ্গে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ রাসুলুল্লাহর অসংলগ্ন প্রশংসা করুক, তা তিনি পছন্দ করতেন না। সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولُهُ»

'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে ইসা বিন মারইয়ামের ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছে। আমি আল্লাহর বান্দা। তাই তোমরা আমার ব্যাপারে বলো, "আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।"'[১৪৯]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরে কী করতেন?' তিনি বলেন :

«كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

'তিনি স্ত্রীদের ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা করতেন। সালাতের সময় হলে তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন।'[১৫০]

---

১৪৮. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২১৫।

১৪৯. সহিহুল বুখারি : ৩৪৪৫।

১৫০. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﵂ আরও বলেন :

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ

'তিনিও অন্য সবার মতো একজন মানুষ ছিলেন। কাপড় পরিষ্কার করতেন; বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের যত্ন নিতেন।'[১৫১]

তিনি আরও বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ জুতো মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, তোমরা যেমন বাড়ির কাজ করো, তিনিও তেমনই করতেন।'[১৫২]

সাইয়িদুনা বারা বিন আজিব ﵁ বলেন, 'খন্দকের দিন আমি রাসুলুল্লাহকে মাটি সরাতে দেখেছি, মাটিতে তাঁর পেটের শুভ্রতা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।'[১৫৩]

তিনি অসুস্থদের খোঁজ-খবর নিতেন। জানাজায় হাজির হতেন। গোলামের ডাকেও সাড়া দিতেন।[১৫৪]

তিনি বলতেন :

«لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»

'আমাকে ছাগলের পায়া খাওয়ার দাওয়াত দিলেও তা আমি কবুল করি এবং আমাকে ছাগলের পায়া হাদিয়া দেওয়া হলেও তা আমি গ্রহণ করি।'[১৫৫]

---

১৫১. মুসনাদু আহমাদ : ২৬১৯৪। হাদিসের মান : সহিহ।
১৫২. মুসনাদু আহমাদ : ২৫৩৪১। হাদিসের মান : সহিহ।
১৫৩. সহিহুল বুখারি : ২৮৩৭।
১৫৪. দেখুন, মাদারিজুস সালিকিন : ২/৩২৮।
১৫৫. সহিহুল বুখারি : ৫১৭৮।

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন,'সাহাবিদের কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে প্রিয় কোনো মানুষ ছিল না। তবুও তাঁরা তাঁকে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়তেন না; কারণ তাঁরা জানতেন তিনি দাঁড়ানো পছন্দ করেন না।'[১৫৬]

তাঁর দরোজা কারও জন্য বন্ধ থাকত না। তাঁর দরোজায় কোনো প্রহরী ছিল না। তাঁর সবকিছু ছিল খোলামেলা। যে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত।[১৫৭]

তিনি মাটিতে বসতেন। মাটিতে খাবার রাখতেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন। গাধায় সওয়ার হতেন। কখনো তাঁর পেছনেও একজন সওয়ার হতো।

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'জনৈক মহিলার মাথায় সামান্য গোলমাল ছিল। একদিন সে রাসুলুল্লাহকে বলে, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনাকে আমার একটু দরকার আছে।"[১৫৮] তিনি বলেন :

«يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ»

"হে অমুকের মা, তোমার ইচ্ছেমতো কোনো গলি দেখো, আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করব।"

তারপর রাসুলুল্লাহ তাকে রাস্তায় একান্তে সময় দেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করেন।'[১৫৯]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন :

«إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، فِي حَاجَتِهَا»

---

১৫৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৭৫৪। হাদিসের মান : সহিহ।
১৫৭. সহিহুল বুখারি : ১২৮৩, সহিহ মুসলিম : ৯২৬।
১৫৮. অর্থাৎ আমি আপনাকে একান্তে কিছু বলতে চাই, কিন্তু লোকদের সামনে বলতে পারছি না।
১৫৯. সহিহ মুসলিম : ২৩২৬।

'মদিনার কোনো দাসীও যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরত, তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিতেন না।[১৬০] দাসীটি তাঁকে তার প্রয়োজনে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত।'[১৬১]

তিনি কাউকে অবজ্ঞা করতেন না। অহংকার করতেন না। গরিব, মিসকিন ও বিধবাদের সঙ্গে চলতে, তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।[১৬২]

হজের সময় সবার সঙ্গে তিনিও মিনায় পাথর নিক্ষেপ করতেন। কাউকে ধাক্কা দিতেন না, কাউকে হটাতেন না। 'সাবধান! সরে যাও, সরে যাও' বলে চিৎকারও করতেন না।[১৬৩]

নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিতেন।[১৬৪] শিশুদেরকেও সালাম দিতেন। তিনি সাহাবিদের মাঝে এমনভাবে বসতেন, অপরিচিত কেউ এলে তাঁকে চিনত না—কাউকে জিজ্ঞেস করতে হতো।[১৬৫]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂ একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন, আপনি হেলান দিয়ে খান, এটি আপনার জন্য অধিক সহজ। তিনি উত্তর দেন :

«لَا، بَلْ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ»

'নাহ, বরং গোলাম যেভাবে খায়, আমিও সেভাবে খাব; গোলাম যেভাবে বসে, আমিও সেভাবে বসব।'[১৬৬]

---

১৬০. অর্থাৎ দাসীটি যেদিকেই যেত, তিনি তাকে অনুসরণ করতেন।

১৬১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৭৭। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬২. সুনানুন নাসায়ি : ১৪১৪। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩০৩৫। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬৪. সুনানু আবি দাউদ : ৫২০৪। ফিতনার আশঙ্কা থাকলে পুরুষ গাইরে মাহরাম নারীকে সালাম দেবে না। তবে বৃদ্ধা মহিলা হলে কোনো সমস্যা নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে যেহেতু ফিতনার আশঙ্কা ছিল না, তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাম দিয়েছেন।

১৬৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৬৯৮।

১৬৬. শারহুস সুন্নাহ, ইমাম বাগাবি : ২৮৩৯। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেন, হাদিসটির অনেক শাহিদ আছে, যেগুলোর কারণে এটি শক্তিশালী ও সহিহ হয়ে যায়। (তাখরিজু শারহিস সুন্নাহ)

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা ﷺ বলেন :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ»

'তিনি বেশি বেশি জিকির করতেন, অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকতেন, সালাত দীর্ঘ করতেন; খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন, বিধবা ও মিসকিনদের সাথে হাঁটতে সংকোচ বোধ করতেন না, যাতে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।'[১৬৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কারও সঙ্গে মুসাফাহ করতেন, যতক্ষণ সে তার হাত টেনে না নিত, রাসুলুল্লাহ নিজের হাত টেনে নিতেন না এবং সে যতক্ষণ চেহারা ফিরিয়ে না নিত, তিনি চেহারা ফেরাতেন না। তিনি তাঁর কোনো সহচরের দিকে পা প্রসারিত করতেন না।[১৬৮]

দয়া ও ভালোবাসা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ﴾

'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[১৬৯]

সাইয়িদুনা আবু জার ﷺ বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ রাতে সালাত আদায় করেন। একটি আয়াত পড়ে পড়ে দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করেন; এভাবে সকাল হয়ে যায়। আয়াতটি হলো—

---

১৬৭. সুনানুন নাসায়ি : ১৪১৪। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৯০। হাদিসটির মান : হাসান।

১৬৯. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[১৭০]

সকাল হলে আমি তাঁকে বলি, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো এই আয়াত পড়ে পড়ে রুকু ও সিজদা করে সকাল করে ফেললেন!' তিনি বলেন :

إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لأُمَّتِي ، وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

'আমার উম্মতের জন্য আমার রবের কাছে আমি শাফাআত প্রার্থনা করেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে এই শাফাআতের অধিকারী হবে।'[১৭১]

সাইয়িদুনা মালিক বিন হুওয়াইরিস ﵁ বলেন, 'একবার আমার গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে আমি রাসুলুল্লাহর কাছে আসি। আমরা বিশ রাত তাঁর সাহচর্যে থাকি। তিনি খুবই দয়ালু ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনি যখন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ দেখেন, তখন তিনি বলেন—

ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

'তোমরা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদেরকে দ্বীন শেখাও। সালাত আদায় কোরো। যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়সে যে বড়[১৭২] সে ইমামতি করবে।'[১৭৩]

---

১৭০. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮।

১৭১. মুসনাদু আহমাদ : ২১৩২৮। শাইখ শুয়াইব আরনাউত ﵀ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

১৭২. যখন অন্য সব বৈশিষ্ট্যে সবাই সমান হবে, তখন যে বড় সে-ই ইমাম হবে। ওই দলের সবাই যেহেতু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে সমান, তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বয়সের কথা বলেছেন। কেননা, তাঁরা একসঙ্গে হিজরত করেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে, রাসুলুল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছে এবং বিশ রাত তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছে। সুতরাং তাঁর থেকে ইলম অর্জনে সবাই সমান। এখন বয়স ব্যতীত প্রাধান্য দেওয়ার উপযোগী আর কোনো বৈশিষ্ট্য রইল না।

১৭৩. সহিহুল বুখারি : ৬২৮, সহিহ মুসলিম : ৬৭৪।

সালাতের জামাআতে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো শিশুর কান্না শুনলে নারীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন।

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»

'সালাতে দাঁড়িয়ে সালাত দীর্ঘ করার ইচ্ছে থাকে। কিন্তু যখন কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ পাই, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। শিশুর কান্নার কারণে মায়ের অন্তরে কেমন ভীষণ প্রতিক্রিয়া করে, তা আমি জানি।'[১৭৪]

হায়া ও লজ্জা

সাইয়িদুনা আবু সায়িদ খুদরি ؓ বলেন :

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ অন্তপুরের কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। কোনো অপছন্দনীয় জিনিস তাঁর চোখে পড়লে, ব্যাপারটি আমরা তাঁর চেহারা দেখেই[১৭৫] বুঝতে পারতাম।'[১৭৬]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির গায়ে হলুদ দাগ দেখতে পান, যা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অপছন্দ হয়। (লোকটি চলে যাওয়ার পর) তিনি সাহাবিদের বলেন :

---

১৭৪. সহিহুল বুখারি : ৭০৯, সহিহু মুসলিম : ৪৬৯।
১৭৫. অর্থাৎ অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে অত্যধিক হায়া ও শরমের কারণে তিনি মুখে বলতেন না। বরং তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত। এতেই আমরা তাঁর অপছন্দের বিষয়টি বুঝতে পারতাম। (আল-মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম)
১৭৬. সহিহুল বুখারি : ৬১০২, সহিহু মুসলিম : ২৩২০।

«لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ»

'তোমরা লোকটিকে এই হলুদ দাগ ধুয়ে ফেলতে বললে খুব ভালো হতো।'

আনাস ﷺ বলেন :

وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ কারও সঙ্গে চেহারায় এমনভাব[১৭৭] নিয়ে মুখোমুখি হন না, যা সে অপছন্দ করে।'[১৭৮]

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ»

'আমার সাহাবিদের কেউ যেন অপর সাহাবি সম্পর্কে আমাকে কোনো অভিযোগ না করে। কারণ আমি চাই, যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন আমার অন্তর যেন তোমাদের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন থাকে।'[১৭৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে কেউ কিছু চাইলে তিনি কখনো ফেরত দিতেন না। সাইয়িদুনা সাহল বিন সাদ ﷺ বলেন, 'একবার জনৈক মহিলা রাসুলুল্লাহর দরবারে একটি হাতে-বোনা পাড়ওয়ালা[১৮০] "বুরদাহ" নিয়ে আসেন। "তোমরা কি জানো বুরদাহ কী?" উপস্থিত শাগরিদগণ বলেন, "চাদর।" তিনি বলেন, "ঠিক বলেছ তোমরা।" মহিলাটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "এই চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি। এখন আপনাকে পরানোর জন্য এসেছি।" রাসুলুল্লাহ ﷺ

---

১৭৭. অর্থাৎ চেহারায় বিরক্তিভাব নিয়ে তিনি কারও মুখোমুখি হন না।

১৭৮. মুসনাদু আহমাদ : ১২৩৬৭, সুনানু আবি দাউদ : ৪১৮২। শাইখ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

১৭৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৬০, সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৬।

১৮০. পাড় মানে পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত।

হাদিয়াটি কবুল করেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তিনি চাদরটি লুঙ্গির মতো পরিধান করে আমাদের সামনে আসেন। তখন জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "এই চাদরটি তো অনেক সুন্দর! আমাকে এটি পরার জন্য দান করুন।" সাহাবিরা বলেন, "কাজটি তুমি ভালো করনি। চাদরটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি পরিধান করেছেন—তুমি এটিই চেয়ে বসলে? অথচ তুমি জানো, তিনি কেউ কিছু চাইলে ফেরত দেন না।" তখন সাহাবি উত্তর দেন, "আল্লাহর কসম, চাদরটি আমি পরার জন্য চাইনি। আমি চেয়েছি, এটিকে নিজের কাফন বানাবার জন্য।" পরে এই চাদরেই তাকে কাফন দেওয়া হয়।[১৮১]

কারও ব্যাপারে কিছু কানে গেলে তিনি নাম ধরে বলতেন না, 'অমুকের কী হলো, সে কেন এমন করছে?' বরং নাম উল্লেখ না করে বলতেন, (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُوْنَ كذا) 'লোকদের কি হলো, তারা কেন এমন কাজ করছে?'[১৮২]

বদান্যতা

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه বলেন :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। রমাজান মাসে তাঁর দানশীলতা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেড়ে যেত—যখন জিবরাইল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিবরাইল রমাজান মাসের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। রাসুল ﷺ ছিলেন প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল।'[১৮৩]

---

১৮১. সহিহুল বুখারি : ১২৭৭।

১৮২. দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৪৫৬, ৭৫০, ৬১০১।

১৮৩. সহিহুল বুখারি : ৬, সহিহু মুসলিম : ২৩০৮।

সাইয়িদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا

'নবিজি ﷺ-এর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলতেন না।'[১৮৪]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'ইসলামের নাম করে রাসুল ﷺ-এর নিকট কিছু চাওয়া হলেই তিনি দিয়ে দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো। দুপাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যায়—এ পরিমাণ ছাগল তিনি তাকে দান করলেন। সে তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বলল :

يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

"হে আমার গোত্র, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। মুহাম্মাদ এত বেশি দান করেন যে, তাঁর অভাবের কোনো ভয় নেই।"'[১৮৫]

সাইয়িদুনা জুবাইর বিন মুতয়িম ﷺ বলেন, 'একবার তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন উপত্যকা থেকে ফিরছিলেন; সঙ্গে আরও অনেক সাহাবিও ছিলেন। পথিমধ্যে কিছু (গ্রাম্য) লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ঘিরে ধরে এবং তাদের কিছু দান করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করে। তারা তাঁকে একটি 'সামুরা'[১৮৬] বৃক্ষের কাছে যেতে বাধ্য করে। সেখানে তাঁর চাদর কাঁটার সঙ্গে আটকে যায়।'[১৮৭] তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন :

«أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا»

'আমাকে আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই বড় কাঁটাদার গাছের সমসংখ্যক উট থাকত, আমি সবগুলো তোমাদের

---

১৮৪. সহিহুল বুখারি : ৬০৩৪, সহিহ মুসলিম : ২৩১১।

১৮৫. সহিহ মুসলিম : ২৩১২।

১৮৬. এক ধরনের দীর্ঘ ও কাঁটাদার বৃক্ষ, যার ছায়া কম, পাতা ছোট; কাঁটা খাটো।

১৮৭. কাঁটায় আটকে গিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর থেকে চাদরটি খুলে গাছে ঝুলে থাকে। ওই গ্রাম্য লোকগুলো সেটি নিয়ে নেয়।

মাঝে বণ্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ, মিথ্যুক ও ভীতু পাবে না।'[১৮৮]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ»

'আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তবুও আমার এটি পছন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে আর আমার কাছে ওই স্বর্ণের কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যাবে[১৮৯]—তবে ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু স্বর্ণ হাতে রেখে দিলে সে কথা ভিন্ন।'[১৯০]

তিনি অন্যদেরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন; তাই অন্যদের খাইয়ে তিনি উপোস করতেন। তাঁর ঘরে দিনের পর দিন আগুন জ্বলত না।[১৯১]

বীরত্ব ও বাহাদুরি

ইসলামের বীর মুজাহিদ সাইয়িদুনা আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন :

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَليه وسَلم ، فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْقَوْمِ مِنْهُ

'যুদ্ধ যখন প্রবল আকার ধারণ করত, মুসলিম বাহিনী যখন দুশমনের মুখোমুখি হতো, আমরা রাসুলুল্লাহর পেছনে আশ্রয় নিতাম। আমাদের মধ্যে তিনিই দুশমনের সবচেয়ে কাছে থাকতেন।'[১৯২]

---

১৮৮. সহিহুল বুখারি : ২৮২১।

১৮৯. তিন দিনের বেশি তাঁর কাছে স্বর্ণের সামান্য অংশও বাকি থাকুক, তা তাঁর পছন্দ নয়। সবগুলো স্বর্ণ দান করে দিতে পারলেই তিনি খুশি হতেন।

১৯০. সহিহুল বুখারি : ২৩৮৯।

১৯১. ইবনু উসাইমিন কৃত মাকারিমুল আখলাক : ৪৫।

১৯২. মুসনাদু আহমাদ : ১৩৪৬। শাইখ আহমাদ শাকির ﷺ বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।

তিনি আরও বলেন :

رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

'বদরের দিন আমরা নিজেদের রাসুলুল্লাহর পেছনে আশ্রয় নিতে দেখেছি; আমাদের মধ্যে তিনিই দুশমনের সবচেয়ে কাছে ছিলেন; তিনিই সেদিন আক্রমণে সবার চেয়ে বেশি তীব্র ছিলেন।'[১৯৩]

সাইয়িদুনা বারা বিন আজিব ﷺ বলেন :

«كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

'লড়াই যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করত, আমরা রাসুল ﷺ-এর পেছনে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে তারাই ছিল বীর, যারা তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যেতেন।'[১৯৪]

একবার জনৈক ব্যক্তি সাইয়িদুনা বারা বিন আজিব ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে, 'হে আবু উমারাহ, হুনাইনের লড়াইয়ে আপনারা পালিয়ে গিয়েছিলেন?' তিনি উত্তর দেন :

لَا وَاللهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ - أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ -، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ

---

১৯৩. মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৪। হাফিজ ইরাকি বলেছেন, হাদিসটির সনদ জাইয়িদ বা উত্তম (তাখরিজুল ইহইয়া : ২/৪৬৭)

১৯৪. সহিহু মুসলিম : ১৭৭৬।

بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ، وَقَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»، ثُمَّ صَفَّهُمْ

'নাহ, আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। অবশ্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু তরুণ সাহাবি তাড়াহুড়ো করে (সারি থেকে) বেরিয়ে পড়েছিলেন; কারণ তাঁরা নিরস্ত্র ছিলেন—বা তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্র ছিল না—আর তাঁরা হাওয়াজিন ও বনু নাসরের এমন এক শত্রুদলের মোকাবিলা করছিলেন, যাদের তির খুব কমই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। তারা এমনভাবে সাহাবিদের ওপর তির বর্ষণ করছিল যে, তাদের প্রায় সব তিরই লক্ষ্যভেদ করছিল। (এই কঠিন অবস্থায়) তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর সাদা খচ্চরে সওয়ার ছিলেন আর আবু সুফইয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ খচ্চর থেকে অবতরণ করলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নুসরত ও সাহায্যের জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন :

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

"নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর নবি—আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরি।"

তারপর তিনি পুনরায় মুজাহিদ বাহিনীকে কাতারবন্দী করেন।'[১৯৫]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, 'রাসুল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর; সবচেয়ে বেশি দানশীল; সবার চেয়ে বেশি বাহাদুর। একরাতে মদীনাবাসী বিকট একটি আওয়াজ শুনল। সবাই আওয়াজের উৎসের দিকে দৌড়াতে লাগল। পথেই তারা রাসুল ﷺ-এর মুখোমুখি হলেন, তিনি তখন ওদিক থেকে ফিরছিলেন, সবার আগেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবু তালহার পালানবিহীন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তলোয়ার। তিনি বলছিলেন, "ভয়ের কিছু নেই; ভয়ের কিছু নেই।" এরপর

১৯৫. সহিহু মুসলিম : ১৭৭৬।

বললেন, "এ ঘোড়াটিকে আমি সাগরের (স্রোতের) মতো গতিশীল পেয়েছি।" অথচ স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াটির গতি ছিল ধীর।'[১৯৬]

এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মুজিজা। স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াটি ধীরগতির হলেও তিনি চড়ার পর সেটি দ্রুতগামী হয়ে গেল। এমনকি সমুদ্রের স্রোতের চেয়েও দ্রুত চলতে লাগল। যে ঘোড়াটি সবার পেছনে থাকত, সে ঘোড়ায় চড়েই রাসুল ﷺ সবার আগে, সবার অগোচরে সবকিছু যাচাই করলেন—আবার ফিরেও এলেন।

১৯৬. সহিহুল বুখারি : ২৯০৮, সহিহ মুসলিম : ২৩০৭।
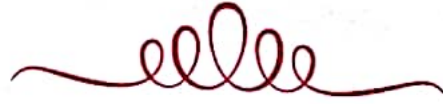
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একনজরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

- রাসুলুল্লাহ ﷺ মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। একজন আদর্শ বান্দা কেমন হবে, তার আল্লাহ-প্রদত্ত নমুনা হলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। এককথায় তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন।

- সদা সত্য বলতেন। জীবনে একটি বারের জন্যও তিনি মিথ্যা বলেননি। উপহাসের ছলেও মিথ্যা বলতেন না তিনি। কোথাও প্রয়োজন হলে তাওরিয়া করতেন বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলতেন।

- সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। অশ্লীল, অসংলগ্ন, অনর্থক কোনো কথা বলতেন না। বেশির ভাগ সময় তিনি নীরব থাকতেন। কাউকে গালি দিতেন না, অভিশাপ দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করার সময় শুধু বলতেন, 'তার কী হলো? তার কপাল ধূলিমলিন হোক।' হো হো করে হাসতেন না। কেবল মুচকি হাসতেন। সবার সঙ্গে যার যার মর্যাদা অনুপাতে কথা বলতেন।

- তিনি রুক্ষ ও বিরস ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বে রসবোধ ছিল। কখনো সাহাবিদের সঙ্গে রসিকতা করতেন। শিশুদের সঙ্গেও হাসাহাসি করতেন। হাসির কথা শুনলে মুচকি হাসতেন। সাহাবিদের কবিতা আবৃত্তি শুনতেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাণখুলে আলাপ করতেন। কখনো তাঁদেরকে পূর্বেকার নবি-রাসুলদের গল্প শোনাতেন।

- দুনিয়ার কোনো স্বার্থ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে রাগান্বিত করত না। তবে হকের প্রশ্নে তিনি আপসহীন ছিলেন। যখন হকের সীমানা লঙ্ঘন করা হতো, তাঁর রাগের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারত না—যে কোনো মূল্যেই তিনি

ব্যবস্থা নিতেন। তিনি নিজের জন্য রাগতেন না, নিজের জন্য প্রতিশোধও নিতেন না। তিনি মন্দের প্রতিদান মন্দের দ্বারা দিতেন না। বরং ক্ষমা করে দিতেন। জিহাদের ময়দান ছাড়া তিনি জীবনে কাউকে আঘাত করেননি; কখনো স্ত্রী বা খাদিমের ওপর হাত তুলেননি।

- পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতেন। স্ত্রীদেরকে ঘরোয়া কাজে সাহায্য করতেন। নিজে কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, জুতো মেরামত করতেন। স্ত্রীদেরকে নিয়মিত সময় দিতেন। তাঁদের সঙ্গে খোশগল্প ও খেলাধুলা করতেন।

- ধৈর্য ও অবিচলতার পাহাড় ছিলেন। পুরো জীবন দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের মাঝে কাটিয়েছেন—কিন্তু কখনো হিম্মত হারাননি। জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, শৈশব থেকেই একে একে প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, পুরো জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে কাটিয়েছেন—কিন্তু একবারও ভেঙে পড়েননি।

- গোটা বিশ্বজগতের জন্য তিনি রহমত ছিলেন। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে কেউ বঞ্চিত হতো না। এমনকি পশুপাখি ও গাছপালার প্রতিও তিনি দয়াভরা আচরণ করতেন। কেউ অসুস্থ হলে দেখতে যেতেন। উম্মতের কল্যাণের জন্য এবং তাদের আখিরাতের মুক্তির জন্য কেঁদে বুক ভাসাতেন।

- প্রবহমান বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন। কেউ কিছু চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। ঘরে কিছু জমা রাখতেন না। খুবই অতিথি পরায়ণ ছিলেন।

- কুমারী মেয়ের মতো লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করলে সাহাবিরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতেন। কাউকে সবার সামনে লজ্জা দিতেন না। কারও নাম উল্লেখ করে সমালোচনা করতেন না।

- প্রবল সাহসী ছিলেন। লড়াই যখন তুমুল আকার ধারণ করত, সাহাবিরা তাঁর পেছনে আশ্রয় নিতেন। শত্রুর সবচেয়ে কাছে থাকতেন। হুনাইন

যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও তিনি একচুল পিছু হটেননি। একজন দূরদর্শী নেতা, প্রজ্ঞাবান শাসক ও বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন।

- অত্যন্ত কোমল ও বিনয়ী ছিলেন। আগে আগে সালাম দিতেন। এমনকি শিশুরাও তাঁর সালাম পেত। নিজের অতিরিক্ত প্রশংসা করার অনুমতি দিতেন না। নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলে পরিচয় দিতেন। কাউকে অবজ্ঞা করতেন না। ফকির মিসকিন গরিবদের সঙ্গে চলতে সংকোচ বোধ করতেন না। আরাম-আয়েশ পছন্দ করতেন না। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতেন।

- বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় অতুলনীয় ছিলেন। সাহাবিদের তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন। যে-ই তাঁর সাহচর্যে আসত, তাঁকে ভালোবেসে ফেলত। সামান্য হাদিয়া হলেও কবুল করতেন। যে কেউ দাওয়াত করলে গ্রহণ করতেন। সাহাবিদের আপদে-বিপদে তাঁদের খোঁজখবর নিতেন। ছোট শিশুদের কোলে নিয়ে আদর করতেন, চুমু খেতেন।

- লেনদেনে খুবই স্বচ্ছ ও আমানতদার ছিলেন। জীবনে কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি। কারও আমানতের খিয়ানত করেননি। তাঁর প্রবাদপ্রতিম আমানতদারিতার কারণে মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল-আমিন' উপাধি দিয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে সবর করেছে, তা যাচাই করার আগেই কি তোমারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে মনে করছ?'–(সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪২)

ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।'
(মুসনাদু আহমাদ : ২২০৫১ ; হাদিসের মান : সহিহ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিহাদের পরিচয়

জিহাদ ইসলামের দুর্গ ও সীমানাপ্রাচীর। দ্বীনের ভিত্তি ও স্তম্ভ। ইসলামি রাষ্ট্রের দুর্জেয় ঘাঁটি। উম্মাহর মজবুত খুঁটি। জিহাদের মাধ্যমেই সুরক্ষিত হয় সম্মান ও মর্যাদা, সংহত হয় মুসলিম ভূখণ্ডের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব। শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা, তাদের সমরশক্তি ধসিয়ে দেওয়া, উদ্ধত শির চূর্ণ করা, ক্ষমতার উত্তাপ নিস্তেজ করে দেওয়া এবং উদগ্র বাসনার রাশ টেনে ধরার একমাত্র উপায় জিহাদ।

ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জিহাদের ওপর নির্ভর করে। জিহাদ দুশমনদের আতঙ্ক, হিংসুকদের মর্মবেদনা এবং বেইমানদের নিষ্ফল ক্রোধের কারণ। জিহাদের মাধ্যমেই বিস্তৃতি লাভ করে ইসলামি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সীমানা, বৃদ্ধি পায় দ্বীনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, সংহত হয় ইসলামের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। সর্বোপরি আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়িত হয় আল্লাহর আইন।

জিহাদ যে জাতিই ছেড়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়েছে। তাদের ওপর চেপে বসেছে অপমানের বোঝা। অসাড় পদযুগল প্যাঁচিয়ে ধরেছে হীনতা ও লাঞ্ছনার কঠিন শিকল। তাদের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে শত্রুর লোভাতুর দৃষ্টি। মনের অজান্তেই তারা পদার্পণ করেছে মৃত্যুর সীমানায়। হৃদয়জুড়ে তাদের অজানা আতঙ্কের নিঃশব্দ বিস্তার। নিজ দেশেই যেন তারা পরবাসী। যেকোনো ক্ষুধার্তের খোরাক তারা। যেকোনো লোভীর লুটের মাল। শত্রুর ক্ষুধা মেটাতে তারা উপোস করে। লুটেরাদের কাপড় জোগাতে তারা বিবস্ত্র থাকে। জালিমের ভাগ্য গড়তে বিলিয়ে দেয় নিজেদের ভবিষ্যৎ।[১৯৭]

---

১৯৭. 'কিতাবুল ওয়াসিলাহ, শাইখ মুহাম্মাদ আবুল ওয়াফা : ৮৪' এর সূত্রে 'চলো জান্নাতের সীমানায়, শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম : ১০।

জিহাদ ইসলামের একটি ফরজ ইবাদত। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'তোমাদের জন্য লড়াই ফরজ করা হয়েছে—যদিও তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ তাআলা জানেন—তোমরা জানো না।'[১৯৮]

জিহাদ ফরজ হওয়ার অন্যতম লক্ষ্য হলো ইসলামকে অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয় দান করা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾

'তিনিই তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহযোগে, সকল দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করার জন্য; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[১৯৯]

যতদিন মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে আঁকড়ে ছিল, তাদেরকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন থেকে কেউ টলাতে পারেনি। কিন্তু যখনই তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, পরাজয় ও লাঞ্ছনার শিকল তাদেরকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

---

১৯৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৬।
১৯৯. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ৯।

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»

'তোমরা যখন ইনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, দ্বীনের পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে না।'[২০০]

সুবহানাল্লাহ! প্রিয় নবি ﷺ কত স্পষ্টভাবেই না বলে গেছেন, আমরা কেন লাঞ্ছিত হব এবং কীভাবে এই লাঞ্ছনা থেকে বেরিয়ে আসব। আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর বুকে পরাজয় ও লাঞ্ছনার যে জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে, এই পাথরকে ছুড়ে ফেলতে হলে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই।

২০০. সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৬২। হাদিসের মান : সহিহ।
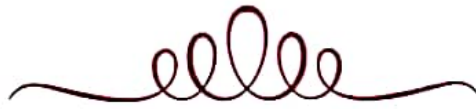
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের বয়ানে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

'তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকেও আতঙ্কিত রাখবে, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা পুরোটাই তোমাদের দেওয়া হবে। তোমাদের প্রতি মোটেও জুলুম করা হবে না।'[২০১]

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾

'আসলে মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিশ্বাস করে, অতঃপর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই হলো সত্যবাদী।'[২০২]

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾﴾

---

২০১. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬০।

২০২. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৫।

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক ও কুফর) দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকেই আক্রমণ করা চলবে না।'[২০৩]

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক ও কুফর) দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের কার্যাবলির[২০৪] সম্যক দ্রষ্টা।'[২০৫]

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা কেন আল্লাহর পথে লড়াই করছ না অসহায় নরনারী ও শিশুদের (রক্ষার) জন্য?—যারা বলছে, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে জালিম অধ্যুষিত এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দিন; আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক বানান এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন।"'[২০৬]

---

২০৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৯৩।
২০৪. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিকভাবে ইসলামগ্রহণই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তাদের গোপন ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও। তিনি প্রকাশ্য গোপন সবকিছু জানেন।
২০৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৩৯।
২০৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৭৫।

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

'যাঁরা মুমিন, তাঁরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে; আর যারা কাফির, তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করো; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।'[২০৭]

﴿وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

'তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।'[২০৮]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾

'আল্লাহ তাআলা তো মুমিনদের কাছ থেকে তাঁদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে—হত্যা করে এবং নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছ, তাতে আনন্দিত হও। আর সেটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।'[২০৯]

﴿فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

---

২০৭. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৭৬।
২০৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৪।
২০৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১।

'সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করুক; আর কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক, আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবই।'[২১০]

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।'[২১১]

﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

'তাদেরকে যেখানে পাও, হত্যা করো এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরা সেই স্থান থেকে তাদের বহিষ্কার করো। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মাসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটিই কাফিরদের পরিণাম।'[২১২]

﴿قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ - وَيُذۡهِبۡ غَيۡظَ قُلُوبِهِمۡۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تُتۡرَكُواْ وَلَمَّا يَعۡلَمِ

---

২১০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৭৪।
২১১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৯০।
২১২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৯১।

ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةًۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমাদের হাতে আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত করবেন আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করে দেবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ তাআলা এখনো তোমাদের মধ্য থেকে চিহ্নিত করেননি, কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[২১৩]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ - ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

'হে নবি, মুমিনদেরকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই। আল্লাহ তাআলা এখন তোমাদের ভার হালকা করে দিয়েছেন। তিনি জানেন যে, তোমাদের মাঝে দুর্বলতা আছে; সুতরাং এখন তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ জনের ওপর

২১৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১৪-১৬।

বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে এক হাজার থাকলে আল্লাহর হুকুমে তারা দুই হাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'[২১৪]

﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾

'আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের চেয়ে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্রীয় লোক, ধনসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করো এবং ঘরবাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো, তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বিধান (শাস্তি) নিয়ে আসেন। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখান না।'[২১৫]

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে সবর করেছে, তা যাচাই করার আগেই কি তোমারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে মনে করছ?'[২১৬]

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ﴾

---

২১৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৫-৬৬।
২১৫. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ২৪।
২১৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪২।

'আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও সবরকারীদের বেছে নিই এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করি।'[২১৭]

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ - إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ব্যাপারটা কী?—যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর পথে জিহাদে বের হও, তখন তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকো? তোমরা কি তবে আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[২১৮]

﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَـٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟ أَن يُجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ﴾

'(তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করে) পেছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ বোধ করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে আর বলেছে, "গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।" আপনি বলে দিন, "জাহান্নামের আগুন আরও অনেক বেশি গরম"—যদি তারা বুঝত!'[২১৯]

---

২১৭. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩১।

২১৮. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৮-৩৯।

২১৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৮১।

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝٣٩ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ﴾

'যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো; কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের রব আল্লাহ।"'[২২০]

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'তোমাদের জন্য লড়াই ফরজ করা হয়েছে—যদিও তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ তাআলা জানেন—তোমরা জানো না।'[২২১]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ﴾

'যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।'[২২২]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাকো এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো—যাতে তোমরা সফল হতে পারো।'[২২৩]

২২০. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৩৯-৪০।
২২১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৬।
২২২. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ৪।
২২৩. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৪৫।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾

'হে মুমিনগণ, কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে লড়াই করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে রয়েছেন।'[২২৪]

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ﴾

'যখন তোমরা কাফিরদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও, তাদের গর্দানে আঘাত করো; পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বেঁধে ফেলো; তারপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করে। এটিই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেন না।'[২২৫]

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

২২৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৩।
২২৫. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪।

‘তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হও, ভালোভাবে যাচাই করে নাও এবং কেউ তোমাদের সালাম করলে দুনিয়ার সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না—তুমি মুমিন নও; কারণ আল্লাহর নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ অনেক আছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে; তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করে নেবে। তোমরা যা করো, আল্লাহ নিশ্চয় সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।’[২২৬]

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ - وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾

‘হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন তোমরা পালিয়ে যেয়ো না। যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনকারী অথবা কোনো দলের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যতীত যে ব্যক্তি সেদিন পলায়ন করবে, সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্য!’[২২৭]

﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾

‘আল্লাহর পথে যারা শহিদ হয়, তাদের তোমরা মৃত বলো না; বরং তাঁরা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।’[২২৮]

﴿ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ - سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ - وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾

---

২২৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৪।

২২৭. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১৫-১৬।

২২৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৪।

'যারা আল্লাহর পথে শহিদ হয়, তিনি কখনো তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। আর তাদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে—যার কথা আগেই জানিয়েছেন তাদেরকে।'[২২৯]

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ - فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং আপন রবের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তাতে তারা আনন্দিত; এবং তাদের পেছনের যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[২৩০]

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ - يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ - خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

'যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, মর্যাদায় তারাই আল্লাহর কাছে বড়। আর তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি আর জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তারা চিরকালের জন্য বাস করবে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।'[২৩১]

---

২২৯. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪-৬।
২৩০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৯-১৭০।
২৩১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ২০-২২।

﴿لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةًۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةًۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

'মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ঘরে বসে থাকা লোকদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটি তাঁর পক্ষ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৩২]

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ﴾

'নিশ্চয় আমি আমার রাসুলগণ ও মুমিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।'[২৩৩]

﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾

'আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়িম করবে, জাকাত দেবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন।'[২৩৪]

---

২৩২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৫-৯৬।
২৩৩. সুরা গাফির, ৪০ : ৫১।
২৩৪. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৪১।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ - تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ - يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ - وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

‘হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো না, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? আর তা হলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়—যদি তোমরা জানতে! যদি তা করো, আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহাসাফল্য। তিনি তোমাদের দেবেন, তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি অনুগ্রহ : আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে তার সুসংবাদ দাও।’[২৩৫]

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾

‘আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান করে।’[২৩৬]

---

২৩৫. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ১০-১৩।
২৩৬. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ২৯।

﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

'তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো, সরঞ্জাম হালকা হোক বা ভারী; আর জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানতে।'[২৩৭]

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

'যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা মুহাজিরদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।'[২৩৮]

﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ - لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ - إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ - وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾

'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! কারা সত্যবাদী তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত কেন আপনি তাদেরকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন? আল্লাহ তাআলা ও কিয়ামতের দিনের প্রতি যাদের ইমান রয়েছে, তারা সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি চাইবে না। আল্লাহ

২৩৭. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪১।
২৩৮. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৭৪।

মুত্তাকিদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। বস্তুত আপনার কাছে তারাই অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না এবং যাদের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই থাকত, তাহলে তারা সেজন্য কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা অপছন্দ করেছেন, তাই তিনি তাদের হতোদ্যম করেছেন এবং তাদের বলা হয়েছে, যারা বাড়িতে বসে আছে তোমরা তাদের সাথেই বসে থাকো।'[২৩৯]

২৩৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪৩-৪৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাদিসের বয়ানে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'আমাকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর সালাত কায়িম করে এবং জাকাত আদায় করে। তারা যদি এসব করে, তবে তারা আমার পক্ষ হতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে—তবে ইসলামের হকের (হুদুদ ও কিসাস) কথা ভিন্ন। আর তাদের (অন্তরের) হিসাবের ভার আল্লাহর হাতে।'[২৪০]

সাইয়িদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵄ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

'আমার উম্মতের একটি দল হকের ওপর অটল থেকে লড়াই করতে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে।'[২৪১]

সাইয়িদুনা আবু জার গিফারি ﵁ বলেন, একবার আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, 'কোন আমলটি উত্তম?' তিনি বলেন :

---

২৪০. সহিহুল বুখারি : ২৫।
২৪১. সহিহ মুসলিম : ১৫৬।

«الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ»

'আল্লাহর প্রতি ইমান এবং আল্লাহ পথে জিহাদ।'[২৪২]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, জীবন ও জবান দিয়ে জিহাদ করো।'[২৪৩]

সাইয়িদুনা আবু সায়িদ খুদরি ﷺ বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' তিনি উত্তর দেন :

«مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»

'যে মুমিন আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে।'[২৪৪]

সাইয়িদুনা উবাদাহ বিন সামিত ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُنَجِّي اللهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ»

'তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো। কেননা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জান্নাতের অন্যতম দরোজা; আল্লাহ তাআলা জিহাদের মাধ্যমে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দেন।'[২৪৫]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবি একবার একটি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সুমিষ্ট সুপেয় পানির একটি ছোট্ট ঝরনা ছিল। চমৎকার এই ঝরনাটি তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। তিনি মনে মনে

---

২৪২. সহিহু মুসলিম : ৮৪।

২৪৩. সুনানু আবি দাউদ : ২৫০৪। হাদিসের মান : সহিহ।

২৪৪. সহিহুল বুখারি : ২৭৮৬।

২৪৫. মুসনাদু আহমাদ : ২২৬৮০। হাদিসের মান : হাসান।

বলেন, "আমি যদি জনপদ ছেড়ে এই উপত্যকায় বাস করতাম, কতই না ভালো হতো! তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত আমি কক্ষনো লোকালয় ছাড়ব না।" তারপর তিনি বিষয়টি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। তিনি বলেন :

«لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»

"এমনটি করো না; কেননা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে সময় কাটানো আপন ঘরে সত্তর বছর সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান? তবে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই চালিয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুবার উষ্ট্রীর দুধ দুহনের মধ্যবর্তী বিরতি পরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।""[২৪৬]

সাইয়িদুনা সাহল বিন সাদ ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»

'আল্লাহর পথে একদিনের রিবাত বা সীমান্ত প্রহরা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় বান্দার কাটানো একটি সকাল অথবা একটি বিকাল, দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।'[২৪৭]

---

২৪৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৫০। হাদিসের মান : হাসান।
২৪৭. সহিহুল বুখারি : ২৮৯২।

সাইয়িদুনা আবু উমামা ﵁ বলেন, একবার জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে সন্ন্যাসবত গ্রহণের অনুমতি দিন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন :

«إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى»

'আমার উম্মতের সন্ন্যাসব্রত হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।'[২৪৮]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ»

'তিনটি বিষয় ইমানের মূল ভিতের অন্তর্ভুক্ত : ক. যে ব্যক্তি (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) বলেছে, তার ব্যাপারে অসংলগ্ন মন্তব্য থেকে বিরত থাকা—আমরা তাকে কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলি না এবং কোনো আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিই না। খ. জিহাদ অব্যাহত থাকবে, আমার নবুওয়তের সময় থেকে এই উম্মতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করা পর্যন্ত। কোনো জালিমের জুলুম এবং কোনো ইনসাফকারীর ইনসাফ জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না। গ. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।'[২৪৯]

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»

---

২৪৮. সুনানু আবি দাউদ : ২৪৮৬। হাদিসের মান : হাসান।

২৪৯. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩২। ইমাম আবু দাউদের মতে হাদিসটি সহিহ। শাইখ শুআইব আরনাউত ﵀ বলেছেন, হাসান লিগাইরিহি।

'জেনে রেখো, নিশ্চয় জান্নাত তরবারির ছায়াতলে।'[২৫০]

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»

'তোমরা যখন ইনা পদ্ধতিতে[২৫১] ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, দ্বীনের পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে না।'[২৫২]

সাইয়িদুনা সাহল বিন সাদ ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«الرَّوْحَةُ وَالغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

'আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল এবং এক বিকাল কাটানো, দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।'[২৫৩]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ»

'সর্বোত্তম জীবন হলো সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর পথে জিহাদে আপন ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়; আর

---

২৫০. সহিহুল বুখারি : ২৮১৮।
২৫১. এক ধরনের সুদি ব্যবসা।
২৫২. সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৬২। হাদিসের মান : সহিহ।
২৫৩. সহিহুল বুখারি : ২৭৯৪।

যখনই দুশমনের আগমন কিংবা শত্রুর পানে ছোটার শব্দ কানে আসে, ঘোড়ায় চড়ে নিমিষেই ছুটে যায় সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে শত্রুকে হত্যা করতে কিংবা নিজের শাহাদাতের খোঁজে।'[২৫৪]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

'আল্লাহর পথের মুজাহিদ ওই ব্যক্তির মতো, যে সারাদিন সাওম পালন করে এবং সারারাত সালাত আদায় করে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন কে (খালিস দিলে) তাঁর পথে জিহাদ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি হয়তো তাদের শাহাদাত দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সাওয়াব ও গনিমতসহ নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনবেন।'[২৫৫]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, "কোন আমলটি আল্লাহর পথে জিহাদের বরাবর হবে?" তিনি উত্তর দেন :

«لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»

"এই আমল করার শক্তি তোমাদের নেই।"

সাহাবিরা আবার একই প্রশ্ন করেন, তিনিও একই উত্তর দেন—"এই আমল করার শক্তি তোমাদের নেই।" তৃতীয়বারও তাঁরা একই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى»

---

২৫৪. সহিহু মুসলিম : ১৮৮৯।
২৫৫. সহিহুল বুখারি : ২৭৮৭।

“আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে দিনভর সাওম পালন করে, রাতজেগে সালাত আদায় করে, আল্লাহর বিধানাবলির প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকে এবং সাওম ও সালাতে সে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না—যতক্ষণ না আল্লাহর পথের মুজাহিদ ফিরে আসে।’[২৫৬]

সাইয়িদুনা সালমান ফারসি ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ»

‘আল্লাহর পথে এক দিন ও এক রাত পাহারা দেওয়া এক মাস সাওম পালন এবং রাতজেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তবে এ আমলের সাওয়াব জারি থাকবে। তার রিজিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে আখিরাতে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।’[২৫৭]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক বিকাল কাটায়, তো যতটুকু ধুলোবালি তার শরীরে লাগে কিয়ামতের দিন তার জন্য ততটুকু মেশক হবে।’[২৫৮]

সাইয়িদুনা উকবাহ বিন আমির ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ. وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ

২৫৬. সহিহ মুসলিম : ১৮৭৮।
২৫৭. সহিহ মুসলিম : ১৯১৩।
২৫৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৭৫। হাদিসের মান : হাসান।

مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا »، أَوْ قَالَ« كَفَرَهَا

'আল্লাহ তাআলা একটি তিরের মাধ্যমে তিনজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন : এক. তিরটির প্রস্তুতকারী—যে সাওয়াবের আশায় সেটি প্রস্তুত করেছে। খ. তিরটি নিক্ষেপকারী। ও গ. তির সরবরাহকারী।[২৫৯] তোমরা তিরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। তোমাদের অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের চেয়ে তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ আমার নিকট বেশি প্রিয়। তিন ধরনের খেলাধুলা অনুমোদিত : ক. ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। খ. আপন স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক করা। ও গ. তির-ধনুক চালনার প্রশিক্ষণ নেওয়া। যে ব্যক্তি তিরন্দাজি শেখার পর অনাগ্রহবশত তা ছেড়ে দেয়, সে একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করে।' অথবা বলেন, 'সে একটি নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করে!'[২৬০]

সাইয়িদুনা মুআজ বিন জাবাল ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا شَحَبَ وَجْهٌ، وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ تُبْتَغَى فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ كَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا ثَقُلَ مِيزَانُ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تَنْفُقُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ»

'সে মহান সত্তার কসম—যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ফরজ সালাতের পরে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মতো এমন কোনো আমল নেই, যার দ্বারা জান্নাতের মর্যাদা কামনা করা হয় এবং যাতে চেহারা ও পা ধুলোমলিন হয়। মিজানে বান্দার নেক আমলের পাল্লা কোনো কিছু দ্বারা এতটা ভারী হয় না, যতটা ওই পশু দ্বারা হয়, যেটি সে আল্লাহর

২৫৯. তির সরবরাহকারী হলো সে ব্যক্তি, যে তিরন্দাজের পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক তির তার হাতে তুলে দেয় এবং প্রতিপক্ষের তির থেকে তাকে রক্ষা করে।

২৬০. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩০০, সুনানু আবি দাউদ : ২৫১৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮১১, সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪৬। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি।

রাস্তায় জিহাদে ব্যবহার করে কিংবা যে পশুর পিঠে সে জিহাদের সরঞ্জাম বহন করে।’[২৬১]

সাইয়িদুনা আবু নাজিহ আস-সুলামি ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ»

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে একটি তির ছুড়ল, সে একটি গোলাম আজাদ করার সমান সাওয়াব পাবে।’[২৬২]

সাইয়িদুনা আমর বিন আবাসা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ، كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে যায়, তবে এটি কিয়ামতের দিন তার জন্য নুর হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একটি তির নিক্ষেপ করে, সেটি দুশমনের গায়ে লাগুক বা না লাগুক, সে একটি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে।’[২৬৩]

সাইয়িদুনা আবু উমামা আল-বাহিলি ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

‘যে ব্যক্তি জিহাদ করে না কিংবা কোনো মুজাহিদের সরঞ্জাম ও পাথেয় প্রস্তুত করে দেয় না অথবা কোনো মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের আগে ভীষণ মুসিবতে ফেলবেন।’[২৬৪]

---

২৬১. মুসনাদু আহমাদ : ২২১২২। হাদিসের মান : হাসান লিগাইরিহি।
২৬২. সুনানুত তিরিমিজি : ১৬৩৮। হাদিসের মান : সহিহ।
২৬৩. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪২। হাদিসের মান : সহিহ।
২৬৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৬২। হাদিসের মান : হাসান।

সাইয়িদুনা জাইদ বিন খালিদ ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا»

'যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের সরঞ্জাম ও পাথেয় প্রস্তুত করে দিল, সে যেন জিহাদ করল আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল।'[২৬৫]

সাইয়িদুনা আবু ইয়াহইয়া খুরাইম বিন ফাতিক ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো কিছু দান করে, এর বিনিময়ে তার জন্য সাতশ গুণ সাওয়াব লেখা হয়।'[২৬৬]

সাইয়িদুনা জাইদ বিন খালিদ আল-জুহানি ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا»

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদের হাতিয়ার ও পাথেয় প্রস্তুত করে দেবে, সে ওই মুজাহিদের সমান সাওয়াব পাবে আর এতে ওই মুজাহিদের সাওয়াব কিছুমাত্র কমে যাবে না।'[২৬৭]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»

---

২৬৫. সহিহুল বুখারি : ২৮৪৩।
২৬৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৬২৫। হাদিসের মান : হাসান।
২৬৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৫৯। হাদিসের মান : সহিহ।

'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে কোনোদিন লড়াই করেনি, এমনকি মনে মনে লড়াইয়ের নিয়তও করেনি, সে মুনাফিকির একটি শাখার ওপর মারা গেল।'[২৬৮]

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ»

'আমি কি তোমাদের এমন একটি রাতের কথা জানাব না, যেটি লাইলাতুল কদরের চেয়েও উত্তম? যে রাতে একজন মুজাহিদ প্রহরী এমন বিপদসংকুল ভূমিতে পাহারা দেয়, যেখান থেকে হয়তো সে পরিবারের কাছে আর জীবিত ফিরতে পারবে না।'[২৬৯]

সাইয়িদুনা উসমান বিন আফফান ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ، كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»

'যে ব্যক্তি একরাত আল্লাহর রাস্তায় রিবাত করবে, সে এক হাজার দিন সাওম পালন ও এক হাজার রাত ইবাদতের সাওয়াব পাবে।'[২৭০]

সাইয়িদুনা আবু উমামা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ»

'দুটি ফোঁটা ও দুটি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই : আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়া একফোঁটা অশ্রু এবং আল্লাহর পথে

২৬৮. সহিহ মুসলিম : ১৯১০।
২৬৯. আল-মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন : ২৪২৪। হাদিসের মান : সহিহ।
২৭০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৬৬। শাইখ আলবানি হাদিসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন। (সহিহুত তারগিব)

ঝরানো এক ফোঁটা রক্ত। আর দুটি চিহ্নের একটি হলো, যা আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে হয় এবং অপরটি হলো, যা আল্লাহর কোনো ফরজ আদায় করতে গিয়ে হয়।'[২৭১]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا»

'আল্লাহর পথের লড়াইয়ের ধুলোবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার পেটে কক্ষনো একত্রিত হতে পারে না।'[২৭২]

সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

'দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না : যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়।'[২৭৩]

সাইয়িদুনা আবু আব্স আব্দুর রহমান বিন জাব্র ﵁ বলেন :

«مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»

'যার পদযুগল আল্লাহর রাস্তায় ধূলিধূসরিত হয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।'[২৭৪]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ»

---

২৭১. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৯। হাদিসের মান : হাসান।
২৭২. সুনানুন নাসায়ি : ৩১১০। হাদিসের মান : সহিহ।
২৭৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৩৯। হাদিসের মান : সহিহ।
২৭৪. সহিহুল বুখারি : ৯০৭।

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুর মালিকানা দেওয়া হলেও কেউ জান্নাতে প্রবেশ করার পর পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না—একমাত্র শহিদ ব্যতীত; সে পৃথিবীতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, যেন আরও দশবার শহিদ হয়। কেননা, সে জানে, শাহাদাতের কী মর্যাদা!'[২৭৫]

সাইয়্যিদুনা আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ»

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয় আর প্রকৃতপক্ষেই যদি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর ইমান ও রাসুলুল্লাহর বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে থাকে, তবে আল্লাহ স্বয়ং তার জিম্মাদার হয়ে যান—হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা অর্জিত সাওয়াব ও গনিমতের অংশসহ তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবেন। সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে—আল্লাহই ভালো জানেন, কে তাঁর পথে আহত হবে—কিয়ামতের দিন সে হুবহু তার সেই জখমি অবস্থায়ই উপস্থিত হবে, (তার জখম থেকে রক্ত গড়াতে থাকবে;) এর রং হবে রক্তের; কিন্তু সুবাস হবে কস্তুরির। সে সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ,

২৭৫. সহিহুল বুখারি : ২৮১৭, সহিহু মুসলিম : ১৮৭৭।

যদি মুসলিমদের কষ্ট না হতো, তবে আমি আল্লাহর পথে লড়াইরত কোনো বাহিনীর পেছনে বসে থাকতাম না;[২৭৬] কিন্তু আমার হাতে এতটুকু সামর্থ্য নেই যে, সবার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করব আর তাদেরও সেই সক্ষমতা নেই। আর আমি লড়াইয়ে চলে গেলে পেছনে বসে থাকতে তাদের অনেক কষ্ট হবে। সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি চাই আমি আল্লাহর পথে লড়াই করে শহিদ হই, আবার লড়াই করে আবার শহিদ হই, আবার লড়াই করে আবার শহিদ হই।'[২৭৭]

সাইয়িদুনা আবু সায়িদ খুদরি ﵁ বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

'হে আবু সায়িদ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নবি হিসেবে সন্তুষ্ট হৃদয়ে গ্রহণ করে নেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।'

এই কথা শুনে আবু সায়িদ ﵁ আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'কথাটি আমাকে আবার বলুন ইয়া রাসুলাল্লাহ।' রাসুলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বলেন। তারপর বলেন :

«وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»

'আরও একটি আমল আছে, যার কারণে জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশত স্তর উন্নীত করা হবে। প্রতিটি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।'

---

২৭৬. অর্থাৎ প্রতিটি লড়াইয়ে শরিক হতাম।
২৭৭. সহিহু মুসলিম : ১৮৭৬।

আবু সায়িদ ﷺ বলেন, 'সে আমল কোনটি?' রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন :

«الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ; জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।'[২৭৮]

সাইয়িদুনা ফাজালাহ বিন উবাইদ ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»

'মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত ব্যক্তির আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে—কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে আল্লাহর পথে পাহারা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার আমলের সাওয়াব কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।'[২৭৯]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ»

'তোমাদের কাউকে চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে, শহিদ মৃত্যুর কষ্ট কেবল ততটুকুই অনুভব করে।'[২৮০]

সাইয়িদুনা সাহল বিন হুনাইফ ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে খাঁটি দিলে শাহাদাত কামনা করবে, তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হলেও আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদদের মর্যাদা দান করবেন।'[২৮১]

---

২৭৮. সহিহু মুসলিম : ১৮৮৪।
২৭৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৬২১। হাদিসের মান : হাসান সহিহ।
২৮০. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৮। হাদিসের মান : হাসান সহিহ।
২৮১. সহিহ মুসলিম : ১৯০৯।

সাইয়িদুনা মিকদাম বিন মাদি কারিব ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

'শহিদের জন্য আল্লাহর কাছে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে : প্রথম রক্তবিন্দু জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ক্ষমা করা হয়; তার জান্নাতের বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করা হয়, আর কিয়ামতের মহাভীতি হতে সে নিরাপদ থাকে। তার মাথায় মর্যাদার তাজ পরিয়ে দেওয়া হয়। এর একেকটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হতে উত্তম। আয়তলোচনা বাহাত্তরজন হুরের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।'[২৮২]

---

২৮২. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৩। হাদিসের মান : সহিহ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রজন্ম বিনির্মাণে রাসুলুল্লাহর কর্মপদ্ধতি

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

'অযোগ্য ব্যক্তিকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।' (সহিহুল বুখারি : ৫৯)

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল প্রেরণ করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।' (৩ : ১৬৪)

প্রথম দরস

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম আদর্শ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার এক অনন্য সমাবেশ ঘটেছিল। তাই সব শ্রেণি, পেশা ও বৈশিষ্ট্যের মানুষ নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কারণ তাঁর নিখুঁত, সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবনের দিকে হাত বাড়ালেই সবাই যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী পাথেয় পেয়ে যাবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের বিশেষ নুসরত ও সাহায্যে ঘেরা ছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সফল হওয়ার নেপথ্যে এই নুসরতের প্রভাবশালী ভূমিকা লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সফল রাসুল, একজন সফল বিচারক, একজন সফল সংগঠক, একজন সফল শাসক, একজন সফল প্রশাসক, একজন সফল সেনাধ্যক্ষ এবং একজন সফল সৈনিক।

তবে আল্লাহর নুসরত থাকার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্যে তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার কোনো প্রভাবশালী ভূমিকা ছিল না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾

'আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভালো জানেন।'[২৮৩]

২৮৩. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১২৪।

রাসুলুল্লাহ ﷺ জীবদ্দশায় যেমন সাহাবিদের জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন, তেমনই মৃত্যুর পরও তিনি উম্মতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগের প্রতিটি ভূখণ্ডের মানুষের জন্য তিনিই অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[২৮৪]

আর উসওয়াতুন হাসানা বা উত্তম আদর্শের মর্ম হলো, কারও কথা ও কাজ সবকিছু অনুসরণীয় হওয়া। পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হওয়ার এই গুণটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আল্লাহ-প্রদত্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

---

২৮৪. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ২১।

দ্বিতীয় দরস

সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন

প্রতিটি শ্রেণি, পেশা ও বৈশিষ্ট্যের মানুষ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সমৃদ্ধ জীবন থেকে যার যার কর্মক্ষেত্রের উপযোগী উৎকৃষ্ট মানবিক গুণ ও দক্ষতা শিখতে পারে। এসব উৎকৃষ্ট মানবিক গুণ ও দক্ষতা সকল মানুষের জন্য এক অনুপম আলোকবর্তিকা—জীবনের বিভিন্ন বাঁকে যেগুলো তাদেরকে পথ দেখাবে এবং জিন্দেগির পরম লক্ষ্য অর্জনে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে ইসরাইলের বিরুদ্ধে চলমান এই যুদ্ধ বড়ই ভয়াবহ। ইসরাইল আরব দেশগুলোতে বসতি সম্প্রসারণের নীলনকশা বাস্তবায়নের পথে এগুচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আরবরা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত থেকে কীভাবে উপকৃত হবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।[২৮৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সিরাত নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা থেকে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি, তাঁর অনুপম প্রতিভা ও দক্ষতার অন্যতম একটি দিক হলো, সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন।

আমি পরিপূর্ণ আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনের এই আশ্চর্য গুণটি তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্যের পার্থিব কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই গুণটির কারণে তিনি যুদ্ধে যেমন বিজয় লাভ করতেন, তেমনই সন্ধিতেও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারতেন।

---

২৮৫. এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। ১৯৬৭ সালে সংগঠিত আরব-ইসরাইল যুদ্ধের রেশ তখনো পুরোপুরি কাটেনি। লেখক তখনই আঁচ করতে পেরেছিলেন, অনাগত দিনগুলোতে ইসরাইল আরব বিশ্বে তার নখর সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করবে। এখন ২০২০ সাল। দুরাচার ইসরাইল এই ৪৭ বছরে তার ঘৃণ্য নীলনকশা বাস্তবায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রত্যেক সাহাবি সম্পর্কে খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত জ্ঞান রাখতেন। প্রতিটি সাহাবির বিশেষ ও স্বতন্ত্র গুণটি সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সবার স্বতন্ত্র প্রতিভা ও দক্ষতাগুলোকে তিনি নবগঠিত ইসলামি সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগাতেন—তাঁদের নিয়োজিত করতেন মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে।

সেই সাথে তিনি প্রত্যেকের ত্রুটি ও অপূর্ণতাগুলোও জানতেন। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি এসব উপেক্ষা করতেন—দেখেও না দেখার ভান করতেন। সবার সঙ্গে কেবল তাঁদের সুন্দর গুণগুলো নিয়েই কথা বলতেন। এমনকি সাহাবিদেরকেও এসব দোষ উপেক্ষা করার নির্দেশ দিতেন এবং সুন্দর গুণগুলোর প্রশংসা করার কথা বলতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এই উৎকৃষ্ট কর্মপদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন পুরো জীবন : সাহাবিদের সুন্দর গুণগুলোর প্রশংসা করেছেন, তাঁদের স্বতন্ত্র দক্ষতাগুলোকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন এবং দোষত্রুটি ও অপূর্ণতাগুলোকে উপেক্ষা করেছেন; সমস্যাগুলো শুধরানোর চেষ্টা করেছেন; সুযোগ ও সময় বুঝে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে তাঁদের পরিশুদ্ধ করেছেন পিতৃসুলভ মমতায়।

এই সুন্দর, নিরাপদ ও বাস্তবসম্মত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি গড়ে তুলেছেন অসংখ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ভাঙেননি, গড়েছেন। তিনি না ভেঙে বাঁকাকে সোজা করতেন; আর নির্মাণ করতেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য। তিনি দূরদর্শী ছিলেন। তাঁর কারবার কেবল বর্তমান নিয়ে ছিল না—প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি ভাবতেন অনাগত ভবিষ্যতের কথা।

তিনি ভালোভাবেই জানতেন, প্রতিটি মানুষের একটি বিশেষ স্বতন্ত্র প্রতিভা থাকে; সেই সঙ্গে তার বিশেষ কোনো দুর্বলতাও থাকে। একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া জগতের কেউ নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ নয়। তিনি প্রত্যেকের সেই বিশেষ প্রতিভাকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতেন; আর ত্রুটিগুলোকে অগ্রাহ্য করতেন এবং সাহাবিরাও পরস্পরের দুর্বলতাগুলোকে উপেক্ষা করতেন। ফলে সেই দোষত্রুটিগুলো নিষ্প্রভ ও অকার্যকর হয়ে পড়ত; সবাই মিলে গুণগুলোকে ফোকাস করার কারণে দোষগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকত এবং একসময় নিঃশেষে মুছে যেত।

তৃতীয় দরস

যোগ্যতার বিচারে দায়িত্ব বণ্টন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই ধনী ছিলেন। মুসলিমসমাজ তাঁদের সম্পদ থেকে উপকৃত হতো।

আবার কেউ কেউ ছিলেন সহজাত নেতা। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতেন—মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতি ও কমান্ডার নিযুক্ত করতেন।

অনেক সাহাবি ব্যক্তিগত বলয়ে অনেক জানবাজ ও বাহাদুর ছিলেন, কিন্তু তাঁদের নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল না। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাজে লাগাতেন, কখনো মুসলিম বাহিনীর ফিদায়ি ও আত্মোৎসর্গী হামলায় তাঁদের ব্যবহার করতেন।

অনেক সাহাবি গভীর চিন্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়নে পারদর্শী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের প্রজ্ঞা, রায় ও পরামর্শ থেকে উপকৃত হতেন।

কতিপয় সাহাবি অত্যন্ত চারুবাক ছিলেন এবং কাব্যশাস্ত্রে অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মুসলিমসমাজ তাঁদের কথা ও কবিতা থেকে উপকৃত হতো।

এভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একেক জন সাহাবিকে একেক কাজে লাগাতেন।

সপ্তম হিজরিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় উমরাতুল কাজা আদায় করতে যান, তখন খালিদ বিন ওয়ালিদের ভাই ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ আল-মাখজুমিকে বলেন, (أين خالد؟) 'খালিদ কোথায়?' তিনি উত্তর দেন, 'আল্লাহ তাকে ইসলামে নিয়ে আসুন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِثْلُهُ جَهِلَ الْإِسْلَامَ وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجِدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ

'তার মতো কেউ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। সে যদি মুসলিমদের পক্ষে মুশরিকদের বিপক্ষে তার শক্তি ও মেধা ব্যয় করত, তবে সে অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারত। আমরাও তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিতাম।'

ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ তাঁর ভাই খালিদ বিন ওয়ালিদকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এসব কথা লিখে জানান। পরবর্তীকালে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথাগুলোই খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।

অষ্টম হিজরির সফর মাসের প্রথম তারিখ তিনি মদিনা হিজরত করেন। নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেন এভাবে : 'আমি রাসুলুল্লাহর কাছে এসে তাঁকে সালাম করি। তিনি হাসিমুখে উত্তর দেন। তারপর আমি বলি :

إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولَ اللهِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ، قَدْ كُنْتُ أَرَى لَكَ عَقْلًا رَجَوْتُ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ

"সকল প্রশংসা সেই মহান রবের, যিনি তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন। আমি তোমার মাঝে যে আকল ও বুদ্ধিমত্তা দেখেছি আমার আশা ছিল, এটি তোমাকে কেবল কল্যাণের দিকেই ধাবিত করবে।"

তারপর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত হই। আমি তাঁকে বলি, "আপনি দেখেছেন, আমি অনেক জায়গায় হকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম; আপনি আমার

জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেন।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ

"ইসলাম পূর্বের সবকিছু মুছে দেয়।"

আমি বলি, "তবুও আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।" তিনি দোয়া করেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كُلَّ مَا أَوْضَعَ فِيهِ مِنْ صَدٍّ عَنْ سَبِيلِكَ

"ইয়া আল্লাহ, আপনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে খালিদ বিন ওয়ালিদ যত অপরাধ করেছে, আপনি সব অপরাধ ক্ষমা করে দিন।"

আল্লাহর কসম, আমার ইসলাম গ্রহণ করার দিন থেকে যে কাজে আমি পারঙ্গম, সে কাজে তিনি কোনো সাহাবিকে আমার সমকক্ষ গণ্য করেননি।[২৮৬]

মুসলিম হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه-কে যুদ্ধের নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেন।

সাইয়িদুনা আমর বিন আস رضي الله عنه-এর বিষয়টিও অনেকটা সাইয়িদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه-এর মতো। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

তাঁরা দুজন যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ مَكَّةُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا

'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।'[২৮৭]

২৮৬. দালাইলুন নুবুওয়াহ : ৪/৩৫০।
২৮৭. উসদুল গাবাহ : ৩/৫৭২। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৪ ইসায়ি।

চতুর্থ দরস

যোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ

সাইয়িদুনা উসমান বিন আফফান ﵁ সম্পদশালী ছিলেন। মুসলিমগণ তাঁর সম্পদ থেকে অনেক উপকৃত হন :

- তিনি বিশ হাজার দিরহাম দিয়ে মুসলিমদের জন্য একটি চত্বর ক্রয় করেন।
- রুমা কূপ[২৮৮] ক্রয় করে তাঁদের জন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা করেন।
- তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি মুজাহিদ বাহিনীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। এই যুদ্ধ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো উসমান ﵁-কে লড়াইয়ের ময়দানে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন বলে আমরা জানি না।

সাইয়িদুনা হাসসান বিন সাবিত ﵁ একজন মহান কবি ছিলেন। মুসলিমগণ তাঁর কাব্যপ্রতিভা থেকে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার সময় কখনো তিনি তাঁকে নারীদের সাথে রেখে যেতেন।

অনেক সাহাবি সাহস ও বীরত্বে অনন্য ছিলেন। কিন্তু মুসলিম-বাহিনীতে তাঁরা সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেছেন; কখনো কমান্ডারের দায়িত্ব পাননি। কারণ তাঁরা সৈনিক হিসেবে দক্ষ হলেও সেনাপরিচালনায় পরিপক্ব ছিলেন না।

অনেক সাহাবি ভালো লেখাপড়া জানতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে ওহি লেখার দায়িত্ব দেন। বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের কাছে তাঁদের মাধ্যমে পত্র-যোগাযোগ করেন।

---

২৮৮. মদিনার একটি প্রসিদ্ধ কূপ। এই কূপটি জনৈক ইহুদির মালিকানায় ছিল। সে মুসলিমদের কাছে এই কূপের পানি বিক্রি করত। সাইয়িদুনা উসমান ﵁ কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

সাহাবিদের মধ্যে কেউ ছিলেন দক্ষ সংগঠক, কেউ প্রজ্ঞাবান দায়ি, কেউ বিচক্ষণ বিচারক, কেউ দক্ষ প্রশাসক। রাসুলুল্লাহ ﷺ সবাইকে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করেন।

কতিপয় সাহাবি তাঁর কাছে প্রশাসক পদের আবেদন করেন, কিন্তু যারা এই দায়িত্ব সামলানোর যোগ্য নন, তিনি তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেন। অনেক সাহাবির ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দেন, কেন তাঁদেরকে প্রশাসক পদ দেওয়া হচ্ছে না।

সাইয়িদুনা আবু মুসা আশআরি ﷺ বলেন, 'একবার আমি ও আমার গোত্রের দুজন লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসি। তাঁদের একজন বলে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে কোনো অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করে দিন।' দ্বিতীয় জনও একই আবেদন করে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ»

'যারা নিজ থেকে দায়িত্ব চায় এবং যারা পদের লোভ করে, তাদেরকে আমরা কোনো পদ দিই না।'[২৮৯]

একবার সাইয়িদুনা আবু জার গিফারি ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি আমাকে প্রশাসনিক কোনো পদ দেবেন না?' রাসুলুল্লাহ ﷺ তার উভয় কাঁধে হাত মেরে বলেন :

«يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

'হে আবু জার, তুমি দুর্বল। আর প্রশাসনিক দায়িত্ব হলো আমানত। কিয়ামতের দিন এটি লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ হবে—তবে যে তার হক আদায় করেছে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছে তার কথা ভিন্ন।'[২৯০]

---

২৮৯. সহিহুল বুখারি : ৭১৪৯।
২৯০. সহিহ মুসলিম : ১৮২৫।

পঞ্চম দরস

গুণ ও দক্ষতার প্রতি মনোযোগ, দোষ ও ঘাটতি উপেক্ষা

মক্কা-বিজয়ের জন্য অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা ছিল এই প্রস্তুতির খবর যেন বাইরে না যায়; মক্কার মুশরিকরা যেন কোনোভাবেই মুসলিম বাহিনীর সামরিক পরিকল্পনার কথা জানতে না পারে—যাতে হঠাৎ আক্রমণ করে বিনা রক্তপাতে মক্কা নগরীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু সাইয়িদুনা হাতিব বিন আবু বালতাআ رضي الله عنه মুসলিমদের সামরিক তৎপরতার খবর জানিয়ে মক্কার মুশরিকদের কাছে একটি চিঠি লিখেন। এদিকে জিবরাইল عليه السلام এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দেন, 'হাতিব বিন আবু বালতাআ গোপনে কুরাইশদের কাছে চিঠি লিখেছে। চিঠি নিয়ে যাচ্ছে একজন নারী।' রাসুলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটির কাছ থেকে চিঠি উদ্ধারের জন্য আলি বিন আবু তালিব, জুবাইর বিন আওয়াম ও মিকদাদ বিন আসওয়াদ رضي الله عنهم-এর নেতৃত্বে সাহাবিদের একটি দল পাঠিয়ে দেন। চিঠিটি রাসুলের কাছে ফেরত নিয়ে আসা হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাতিব رضي الله عنه-কে তিরস্কার করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি এই কাজ করেছ?' তখন হাতিব رضي الله عنه বলেন, তাঁর পরিবার এখনো মক্কায় পড়ে আছে এবং তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, তিনি যদি কুরাইশদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখান, তবে তারা তাঁর পরিবারের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে।

যুদ্ধের নীতিমালা অনুসারে হাতিব رضي الله عنه-এর এই কাজ জঘন্য গাদ্দারির পর্যায়ে পড়ে। তাই সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো।' কিন্তু একটি মাত্র ভুলের কারণে রাহমাতুল-লিল-আলামিন হাতিবের ফেলে আসা সোনালি দিনগুলো ভুলে যাননি। তিনি উমর رضي الله عنه-কে বলেন :

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

'হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়তো জানা নেই, আল্লাহ তাআলা বদরি সাহাবিদের (মৃত্যু পর্যন্ত) বৃত্তান্ত আগে থেকেই জানেন। তাই তো তিনি বদরিদের সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমরা যা-ই ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"'[২৯১]

সাইয়িদুনা হাতিবের পক্ষে সুপারিশ করে তাঁর অতীতের জিহাদি জীবন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের হাতিবের সুন্দর গুণগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এই ঘটনার পরও সাইয়িদুনা হাতিব ﷺ মুসলিমসমাজে পূর্বের মতো সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। কেউ তাঁকে কোনো ধরনের দোষারোপ করেনি। সাহাবিরা কেবল তাঁর সুন্দর গুণগুলোর কথাই আলোচনা করেছেন। তাঁর পছন্দনীয় কথাই বলেছেন। তাঁকে বিব্রত করে এমন কোনো শব্দ তাঁরা উচ্চারণ করেননি।

২৯১. সহিহুল বুখারি : ৩০০৭।

ষষ্ঠ দরস

অপরাধীকে শুধরে ওঠার সুযোগ দান

আবু জাহেল ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে বড় দুশমন—ইসলাম ও মুসলিমদের মারাত্মক শত্রু। বদর যুদ্ধে সে নিহত হয়। তার পতনে সবাই খুশি হয়েছিল। কারণ তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুসলিমরা একজন কঠিন দুশমনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

আবু জাহেলের ছেলে ইকরামাও ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোরতর শত্রু। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছে। মক্কা-বিজয়ের দিন সে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী উম্মে হাকিম ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে স্বামীর জন্য নিরাপত্তা চান। তিনি এই আবেদন মঞ্জুর করেন।

মক্কা-বিজয়ের পর সাইয়িদুনা ইকরামা বিন আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অল্প সময়েই তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আল্লাহর পথে যারা জানমাল দিয়ে লড়াই করছেন, তাঁদের তালিকায় তাঁর নামও উঠে আসে। ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম অগ্রনায়ক হিসেবে তিনিও আবির্ভূত হন এক অনন্য মহিমায়।

ভেবে দেখুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলামের একজন ঘোরতর দুশমনকে কীভাবে নিরাপত্তা দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ করে দিলেন। ইসলামগ্রহণের পর কেউ আর ইকরামা ﷺ-এর অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেননি। মুসলিমসমাজে তিনি বরিত হয়েছেন একজন বাহাদুর ও জানবাজ মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ হিসেবে!

সপ্তম দরস

নববি তারবিয়াহর দুটি অমূল্য কর্মনীতি

রাসুলুল্লাহ ﷺ ভালোভাবে জানতেন, কোন সাহাবির মাঝে কী কী প্রতিভা ও যোগ্যতা আছে। তিনি সবাইকে যার যার মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজে লাগাতেন। তাঁদের সুন্দর গুণগুলোর প্রশংসা করতেন; তাঁদের উৎসাহ দিতেন এবং তাঁদের দক্ষতাগুলোকে আরও সংহত ও ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে তাঁদের অতীতের সব ভুলত্রুটি ভুলে যেতেন। ব্যক্তিত্ব গঠনে এটিই হলো নিখুঁত ও কার্যকর কর্মপন্থা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন রফিকে আলার ডাকে সাড়া দিয়ে আখিরাতের পথে পাড়ি জমান, দুনিয়াতে তিনি রেখে যান অসংখ্য বিজ্ঞ ও দক্ষ নেতা, শাসক, প্রশাসক, আলিম, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও বিচারক—যাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অবর্তমানে শক্ত হাতে মুসলিম উম্মাহর হাল ধরেছেন; উম্মাহর নৈতিক, প্রশাসনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং তাঁদেরকে চালিত করেছেন সত্য, কল্যাণ, মর্যাদা, উন্নতি ও অগ্রগতির পথে।

চলমান সময়ের বাস্তবতায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন থেকে আমাদের এই অমূল্য শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা উচিত :

▶সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন।

▶পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দক্ষ ও যোগ্য জনসম্পদ বিনির্মাণ।

গোটা মুসলিম উম্মাহর বিশেষ করে আরবদের উচিত মুসলিমসমাজের প্রতিটি সদস্যের মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানো—চাই তা তাত্ত্বিক হোক বা প্রায়োগিক। কারণ উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের মাঝে লুকিয়ে আছে স্বতন্ত্র

প্রতিভা ও দক্ষতা, যেগুলোকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করা সময়ের অপরিহার্য দাবি। আমাদের উচিত প্রত্যেকের সুন্দর গুণগুলোকে ফোকাস করা এবং পরস্পরের দোষক্রুটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া। আমাদের উচিত উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করা।

যারা মুসলিম ব্যক্তিত্বগুলোকে ভাঙার জন্য কাজ করছে, তারা মূলত ইসরাইলের খিদমত করছে, আরব ও ইসলামের দুশমনদের কল্যাণে কাজ করছে।

সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনের এই কর্মপন্থা ব্যক্তিত্ব গঠনে যেমন জরুরি, তেমনটি জাতি গঠনেও অপরিহার্য। কবি কত চমৎকারই না বলেছেন :

يَبْنِيْ الرِّجَالَ وَغَيْرُهُ يَبْنِيْ القُرى شَتَّانَ بَيْنَ مَزَارِعَ وَرِجَال

> 'পিতারা দুই ধরনের : একধরনের পিতারা সন্তানদের যথাযোগ্য তালিম-তরবিয়তের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্ণধার হিসেবে গড়ে তোলেন; আরেক ধরনের পিতারা সম্পদ সঞ্চয় ও খেত-খামারের পরিচর্যায় সময় ব্যয় করেন—সন্তানদের গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেন না। রাশি রাশি সম্পদ উপার্জন ও যোগ্য সন্তান বিনির্মাণের মাঝে কল্যাণের বিচারে কত বিশাল পার্থক্য!'

এখন প্রশ্ন হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ কীভাবে এত বেশি সংখ্যক ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করেছিলেন? কীভাবে তিনি তাঁর সময়কে মানবেতিহাসের স্বর্ণযুগে পরিণত করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বড়ই সরল। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন জীবন্ত নমুনা ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথাই তিনি কাজে পরিণত করতেন। তিনি নিজেকেই তাঁর সাহাবিদের সামনে একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে তিনি ব্যক্তিস্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে কুরবানি করেছেন। তাই তো তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছেন অসংখ্য যোগ্য, বিশ্বস্ত, মেধাবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, যাঁরা ইসলামি সমাজের জন্য বয়ে এনেছে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।

সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যুগে যুগে গবেষকগণ এই কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কাজের জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছিলেন, তিনি ছিলেন ওই কাজের জন্য সেই সময়ের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

'অযোগ্য ব্যক্তিকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।'[২৯২]

একটু ভেবে দেখুন!

আমরা কি সিরাতুন্নবি থেকে এই অমূল্য শিক্ষাটি গ্রহণ করব?

উম্মাহর এই বিপর্যয় দেখেও আমাদের বোধোদয় ঘটবে না? নাকি এতটুকু বিপর্যয় যথেষ্ট নয়—হুঁশ ফেরার জন্য, সঠিক পথে উঠে আসার জন্য আরও কঠিনতর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে?

২৯২. সহিহুল বুখারি : ৫৯।

উপসংহার

বিজয়ের কারণ ও উপকরণ

﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

‘তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখ করো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।’ (৩ : ১৩৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ

‘এই উম্মাহকে উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, বিজয় ও পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভের সুসংবাদ দাও।’ (মুসনাদু আহমাদ : ২১২২২; হাদিসের মান : হাসান)

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রিয় নবির জিহাদি জীবন

রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক—জগতের সকল শাসকদের তিনি গৌরব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন আদর্শ নেতা ও সংগঠক—জগতের সকল নেতা ও সংগঠকদের তিনি সর্দার।

রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন আদর্শ বিচারক—জগতের সকল বিচারকদের তিনি মাথার মুকুট।

রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক—জগতের সকল সেনাপতির তিনি প্রেরণা।

যে কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি পাড়ি দিয়ে মুসলিমরা সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেছে, তা বিবেচনা করে সমরবিদরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে একজন শ্রেষ্ঠ ও সফল সমরনায়ক হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। নেতৃত্ব ও লড়াইয়ের ময়দানে মুসলিমদের অভিনব সমরকৌশল এখনো যুদ্ধ-বিশারদদের গবেষণার বিষয়বস্তু।

একজন সিরাত-গবেষক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন যে, নবুওয়তলাভের পর থেকে রফিকে আলার[২৯৩] ডাকে সাড়া দেওয়া পর্যন্ত পুরো জীবন তিনি ব্যয় করেছেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে : মক্কায় তাওহিদের দাওয়াহর আওতায় জিহাদের জন্য লোকদের প্রস্তুত করেছেন, আর মদিনায় তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেছেন।

---

২৯৩. পরম বন্ধু তথা আল্লাহ তাআলা।

মদিনায় হিজরতের পর মাত্র সাত বছরে রাসুলুল্লাহ ﷺ ২৮টি যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব দেন। তাঁর সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল 'ওয়াদ্দানের যুদ্ধ'—যেটি দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে সংঘটিত হয়; আর সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল 'তাবুক যুদ্ধ'—যেটি অষ্টম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে নয়টি যুদ্ধে মুশরিক বা ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই বাধে : বদর, উহুদ, খন্দক, কুরাইজা, বনু মুসতালিক, খাইবার, মক্কা-বিজয়, হুনাইন ও তায়িফ; বাকি ১৯টি যুদ্ধে মুশরিকরা লড়াই না করে পালিয়ে যায়।

মুসলিমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে যত যুদ্ধেই লড়াই করেছে, প্রতিটি যুদ্ধেই বিজয় লাভ করেছে। এমনকি উহুদ যুদ্ধেও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমদের পরাজয় ঘটেনি; কারণ এটি কৌশলগত বিজয় ছিল, যদিও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরাজিত হতে হয়েছিল তিরন্দাজরা সেনাধ্যক্ষ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করেছিল বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়ের কারণ ও উপকরণ

এখন প্রশ্ন হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার নেপথ্য কারণগুলো কী ছিল?

সবগুলো কারণকে তিনটি পয়েন্টে সংক্ষেপে বলা যায় :

১. আদর্শ নেতৃত্ব—নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ।

২. আদর্শ সৈন্যবাহিনী—ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ মুমিনরা ছিলেন এই বাহিনীর সৈনিক।

৩. ন্যায় যুদ্ধ (Just War)—মুসলিমরা লড়েছিল কাফিরদের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

এখানে আমরা এই তিনটি পয়েন্ট নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আদর্শ নেতৃত্ব

আধুনিক সমরবিদ্যার অন্যতম উৎকৃষ্ট উৎসগ্রন্থ (نِظَامَاتُ الْخِدْمَةِ السَّفَرِيَّة)-এর আলোকে একজন সফল সেনাপতির মৌলিক গুণগুলো হলো :

- দ্রুততম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- প্রবল সাহস ও বীরত্ব।
- দৃঢ়তা ও অবিচলতা।
- নির্দ্বিধায় দায়িত্ব গ্রহণের মনোবৃত্তি।
- সমরনীতি বিষয়ক জ্ঞান।
- অদম্য মানসিক শক্তি, জয়-পরাজয় যাকে প্রভাবিত করতে পারে না।
- দূরদর্শিতা।
- অধীনস্থদের যোগ্যতা ও মানসিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবগতি।
- সেনাপতির প্রতি সৈনিকদের অগাধ আস্থা এবং সৈনিকদের প্রতি সেনাপতির অটুট বিশ্বাস।
- সেনাপতি ও সৈনিকদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা বিনিময়।
- প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
- দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য।
- উজ্জ্বল ও গৌরবময় অতীত।

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও সফল সেনাপতিদের জীবনী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনা করে এই গুণগুলো নির্ণয় করা হয়েছে। তাই উল্লিখিত গুণগুলো বিশেষ কোনো ব্যক্তির নয়; বরং অসংখ্য সফল সেনাপতির জীবনের সারনির্যাস। তাই একই ব্যক্তির মাঝে সবগুলো গুণের সমাবেশ ঘটা সম্ভব নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মহিমান্বিত সামরিক জীবনের আলোকে এখন আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এসব গুণের উপস্থিতি তাঁর জীবনীতে কীরূপ ছিল।

দ্রুততম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

একজন সেনাপতিকে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কারণ রণাঙ্গনের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই বদলে যায়। একই সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত হয় নিখুঁত ও সঠিক, যা বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। কারণ ভুল সিদ্ধান্ত যেকোনো সময় ডেকে আনতে পারে সমূহ বিপর্যয়। তবে এই দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে :

১. সেনাপতির প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা।

২. শত্রু সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সর্বজনবিদিত—এই ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম কারও কোনো দ্বিমত নেই। তিনি পরম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আরবদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন, একাই গোটা জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, বিতর্ক করেছেন, মুসলিমদেরকে সংগঠিত করেছেন, তাঁদের হৃদয়ের গভীরে গেঁড়ে দিয়েছেন ইমান ও আকিদার বীজ, অসংখ্য যুদ্ধে তিনি সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন, পরাজিত করেছেন প্রবল শক্তিধর অসংখ্য শত্রুবাহিনীকে—অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা ছাড়া এমন অনুপম সাফল্য অর্জন কি আদৌ সম্ভব?

বাকি রইল শত্রু সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি। বিভিন্ন উপায়ে এই কাজটি করা হয়। যেমন :

- তথ্যানুসন্ধানী দল প্রেরণ।
- পূর্বের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা।
- শত্রু এলাকায় নিযুক্ত গোয়েন্দাদের সরবরাহকৃত তথ্য।
- বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ।

- সেনাপতির ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও জরিপ।
- যুদ্ধে অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে পরামর্শ।

বদর যুদ্ধের পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক ছোট অভিযান পরিচালনা করেন। কোনো কোনো অভিযানের নেতৃত্ব তিনি নিজেই দিয়েছেন আবার কোনো কোনো অভিযানে কোনো সাহাবিকে কমান্ডার বানিয়ে সেনাদল প্রেরণ করেন। এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, মদিনার চারপাশের অঞ্চলগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন, মক্কাগামী পথগুলো চিহ্নিতকরণ, আশেপাশের জনপদগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় ও চুক্তি সম্পাদন।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আবু সুফইয়ানের কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। বদর অভিমুখে মূল বাহিনী মার্চ করার পূর্বে তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একাধিক দল পাঠান। বদর প্রাঙ্গণে পৌঁছার পূর্বেও তিনি ময়দানের তথ্য সংগ্রহের জন্য দল পাঠান। কুরাইশের সামরিক শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবেও অনুসন্ধান চালান।

বদর যুদ্ধের অল্প সময় পূর্বে অনুসন্ধানী দলের গ্রেফতারকৃত কিছু বন্দীকেও তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অদ্ভুত কৌশলে তিনি তাদের মুখ থেকে জেনে নেন, কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান ও সংখ্যা।

বিরল সাহস ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি

প্রতিটি যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরল সাহস ও বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমনকি সামরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কাজেও তিনি অসাধারণ সাহসের স্বাক্ষর রাখেন।

স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে বদর যুদ্ধে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলায় বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে যাওয়া তাঁর বিরল সাহসের পরিচয় বহন করে। খন্দক যুদ্ধে ১০,০০০ বাহিনীর সামনে তিনি প্রদর্শন করেন অবিচলতার পরাকাষ্ঠা।

হুনাইন যুদ্ধে মাত্র দশজন মুজাহিদ নিয়ে তিনি পর্বতের মতো অটল থাকেন দুশমনের তিরবৃষ্টির সামনে—এমন সাহস সত্যিই বর্ণনাতীত!

বদর যুদ্ধে লড়াই যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তিনি সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হন। সাধারণ মুজাহিদদের সঙ্গে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন দুশমনদের ওপর। এই দিন সম্পর্কে সাইয়িদুনা আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন :

رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

'বদরের দিন আমরা নিজেদের রাসুলুল্লাহর পেছনে আশ্রয় নিতে দেখেছি; আমাদের মধ্যে তিনিই দুশমনের সবচেয়ে কাছে ছিলেন; তিনিই সেদিন আক্রমণে সবার চেয়ে বেশি তীব্র ছিলেন।'[২৯৪]

সাইয়িদুনা বারা বিন আজিব ﷺ বলেন :

«كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

'লড়াই যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করত, আমরা রাসুল ﷺ-এর পেছনে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে তাঁরাই ছিল বীর, যারা তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যেতেন।'[২৯৫]

মক্কায় মুশরিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা ও প্রবল আক্রমণের মুখে তিনি পর্বতের মতো অবিচল ছিলেন। নবুওয়তলাভের পর থেকে রফিকে আলার ডাকে সাড়া দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াহ ও জিহাদের প্রশ্নে পদে পদে তিনি যে দৃঢ়তা ও অটলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে তুলে ধরা কোনো শক্তিশালী কলমের পক্ষেও সম্ভব নয়। এটি তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অবিচল সংকল্পের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

---

২৯৪. মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৪, হাফিজ ইরাকি বলেছেন, হাদিসটির সনদ জাইয়িদ বা উত্তম (তাখরিজুল ইহইয়া : ২/৪৬৭)

২৯৫. সহিহ মুসলিম : ১৭৭৬।

একবার কুরাইশের একটি দল চাচা আবু তালিবের কাছে গিয়ে হুমকি দেয়, মুহাম্মাদ যদি ইসলামের দাওয়াত বন্ধ না করে, তাহলে মক্কায় গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। চাচা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, 'আমার ভাইপো, তোমার গোত্রের লোকেরা আমার কাছে এসে এই এই বলেছে। সুতরাং তুমি নিজেকে সংযত করো; আমার ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা আমি বহন করতে পারি না।' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন, 'ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবুও আমি এই দাওয়াহ থেকে পিছু হটব না। হয় আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করবেন, নয় আমি এই দাওয়াহর পেছনে নিজেকে বিলিয়ে দেবো।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পুরো জীবনটিই তো প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অবিচল সংকল্পের গল্প!

অদম্য মানসিক শক্তি

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মানসিক শক্তি এতটাই দৃঢ় ছিল যে, জয় বা পরাজয়ে তাঁর কোনো ভাবান্তর ঘটত না। সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও স্নায়ুর ওপর তাঁর এত নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ থাকত—যা কল্পনাকেও হার মানায়।

উহুদের রণাঙ্গনে যখন মুশরিকরা মুসলিম বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ কাজ ছিল না। খন্দক যুদ্ধে যখন বহুজাতিক বাহিনী মদিনায় হামলে পড়েছিল, বিশেষ করে ইহুদিদের গাদ্দারির পর স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা সহজ কাজ ছিল না। হুনাইন যুদ্ধে তীব্র তিরবৃষ্টির মুখে যখন মুসলিমরা পিছু হটে যায়, তখন মাত্র দশজন সাহাবি নিয়ে ময়দানে পাহাড়ের মতো অটল থাকা মোটেও সহজ কাজ ছিল না—এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শক্তিশালী স্নায়ুর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দূরদর্শিতা

সামরিক কার্যক্রম হোক বা বেসামরিক, প্রতিটি কাজেই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুপম দূরদর্শিতাকে কাজে লাগাতেন। সিরাতের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে তাঁর দূরদর্শিতার অসংখ্য নির্দশন।

সাহাবিদের প্রবল অসন্তোষ সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ হুদাইবিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তগুলো মেনে নেন—যদিও অনেকগুলো শর্ত মুসলিমদের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অতুলনীয় দূরদর্শিতাকে কাজে লাগান। তিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে পারেন, এই চুক্তি মুসলিমদের জন্য বিজয় নিয়ে আসবে—যুদ্ধবিরতির স্থিতিশীল পরিবেশ ইসলাম প্রচারের জন্য খুবই অনুকূল হবে। পরবর্তীকালে সত্যি সত্যি তা-ই ঘটে। হুদাইবিয়া অভিযানে যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪০০, সেখানে মাত্র দুই বছর পর মক্কা অভিযানে তাঁদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় দশ হাজারে!

সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সাহাবির যোগ্যতা ও মানসিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেন। কারণ অন্য দশজন মানুষের মতো তিনিও তাঁদের মাঝেই বেড়ে উঠেছিলেন; তাঁদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন জীবনের সুখ-দুঃখ।

তিনি জানতেন, তাঁর সাহাবিদের মাঝে অনেকেই দুঃসাহসী জানবাজ সৈনিক। তিনি তাঁদেরকে সাহস ও বীরত্বের প্রয়োজন হয় এমন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন; যেমন : সাইয়িদুনা আবু দুজানা ﵁।

অনেক সাহাবি কবিতা ও বক্তৃতায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু লড়াই করার মতো মানসিক শক্তি তাঁদের ছিল না। যেমন : সাইয়িদুনা হাসসান বিন সাবিত ﵁। তাই উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নারীদের সঙ্গে রেখে যান। কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রতিভা থেকে মুসলিমরা উপকৃত হতো।

অনেক সাহাবি খুবই প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ছিলেন, যারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে জানতেন। অনেক সাহাবি নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখতেন। আবার অনেক সাহাবির

কেবল সৈনিক হওয়ার দক্ষতা ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ সবাইকে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করতেন।

কোনো সাহাবিকে তিনি এমন কোনো দায়িত্ব দিতেন না, যা পালন করার শক্তি ও যোগ্যতা তাঁর নেই। আবার কারও কাঁধে সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝাও চাপাতেন না।

পারস্পরিক আস্থা

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। কেবল হুদাইবিয়া সন্ধির ঘটনাই এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের অটুট আস্থা না থাকত, তাঁরা হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করতেন।

পক্ষান্তরে সাহাবিদের প্রতিও ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। কেবল বদর যুদ্ধের ঘটনাই বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। মুষ্টিমেয় কয়েক জন সাহাবিকে নিয়ে তিনি বদরের প্রান্তরে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশমনদের সামরিক শক্তি মুসলিমদের চেয়ে তিনগুণ বেশি ছিল।

স্বল্পসংখ্যক সৈনিক ও অপ্রতুল সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে কোনো সেনাপতি বিশাল শক্তিধর বাহিনীর মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে না—যদি না আপন বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে তাঁর অটুট আস্থা না থাকে।

পারস্পরিক ভালোবাসা

প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা এবং সাহাবিদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার নিদর্শন দেখতে পাই—এমনকি সাহাবিদের দৈনন্দিন জীবনও ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসায় ঘেরা।

কেবল উহুদ যুদ্ধের ঘটনাই বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। উহুদের উত্তাল রণাঙ্গনে যখন মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে, তখন

তাঁকে তিরবৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য সাহাবিরা নিজেদের শরীর দিয়ে ব্যূহ রচনা করেন। প্রিয় নবির জন্য আপন দেহকে ঢাল বানাতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি!

প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য কুরাইশরা উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফিকে প্রেরণ করে। আলোচনা শেষে সে মক্কায় ফিরে গিয়ে বলে, 'আমি কিসরাকে[২৯৬] দেখেছি, কাইসারকে[২৯৭] দেখেছি, দেখেছি নাজাশিকেও।[২৯৮] কিন্তু আমি মুহাম্মাদের মতো কোনো বাদশাহ দেখিনি, সে যখন অজু করে, তাঁর সাহাবিরা তাঁর শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানিটুকু সংগ্রহের জন্য ছোটাছুটি করে; তাঁর মাথা থেকে একটি চুল পড়লেও তারা তা হস্তগত করার জন্য দৌড়ে যায়; তারা কোনো কিছুর বিনিময়েই মুহাম্মাদকে সোপর্দ করবে না।'

এভাবেই একজন মুশরিক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিল।

এখন আমাদের জানতে হবে, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের উপকরণগুলো কী কী, যেগুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল?

রাসুলুল্লাহ ﷺ খুবই বিনয়ী ও সহনশীল ছিলেন; কোমল ও দয়ালু ছিলেন—তবুও কোনো সাহাবি তাঁর সামনে গলা উঁচু করে কথা বলতে পারতেন না; তাঁর চোখে চোখ রাখতে পারতেন না; একদৃষ্টে তাকাতে পারতেন না তাঁর উজ্জ্বল চেহারার দিকে; তাঁর কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করার শক্তি রাখতেন না—এমনকি তাঁর হুকুম পালনে দ্বিধা করারও সাহস পেতেন না।

---

২৯৬. পারস্যের সম্রাটদের উপাধি।
২৯৭. রোমের সম্রাটদের উপাধি।
২৯৮. হাবশার বাদশাহদের উপাধি।

দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য

রাসুলুল্লাহ ﷺ অতুলনীয় দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সাইয়িদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, 'খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এমন সময় একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়ে এল, যেটি ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। সকলেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "পরিখার মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে—আমরা তা ভাঙতে পারছি না।" এ কথা শুনে তিনি বললেন, (أَنَا نَازِلٌ) "আমি নিজেই খন্দকে অবতরণ করব।" এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোনো কিছুর স্বাদও গ্রহণ করিনি। রাসুল ﷺ একটি কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হলো।'[২৯৯]

বদর যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ দুজন সাহাবির সঙ্গে একটি উটে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে মদিনা থেকে বদর প্রান্তরে যাচ্ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই সাথিকে বলেন :

مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا

> 'তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালীও নও এবং সাওয়াবের প্রতি আমি তোমাদের চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নই।'[৩০০]

পাহারাদারি, তথ্যানুসন্ধান, পরিখা খনন, অবকাঠামো নির্মাণ, যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ অসংখ্য সামরিক ও বেসামরিক কাজে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি কাজে তিনি অতুলনীয় ধৈর্য ও দৈহিক শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।

---

২৯৯. সহিহুল বুখারি : ৪১০১, সহিহ্ মুসলিম : ২০৩৯।

৩০০. মুসনাদু আহমাদ : ৩৯০১। হাদিসের মান : সহিহ।

আরবরা বনেদি বংশকে খুব মূল্যায়ন করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ জন্মেছিলেন আরবের সবচেয়ে অভিজাত কুরাইশ বংশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বনু হাশিম গোত্রে। এমনকি মায়ের দিক থেকেও তিনি শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত আরব ব্যক্তিত্ব। তাঁর মায়ের বংশ পরম্পরা হলো : আমিনা বিনতু ওয়াহব বিন আবদু মানাফ বিন জুহরা বিন কিলাব। আর পিতার বংশ পরম্পরা হলো : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদু মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা ও পিতার বংশপরম্পরা তাঁর ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ কিলাব পর্যন্ত গিয়ে এক হয়ে যায়।

আর নবুওয়তের পূর্বে তাঁর ব্যক্তিজীবন কেমন ছিল, এই বিষয়টি আমি স্যার উইলিয়াম ম্যুরের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি—তিনি আরবও নন, মুসলিমও নন; তাই পক্ষপাতের আশঙ্কাও নেই।

তিনি বলেন, 'আমাদের সকল ঐতিহাসিক সূত্র ও উৎসগ্রন্থ একযোগে এই কথাই বলছে যে, "মুহাম্মাদের যৌবন আশ্চর্যজনকভাবে বিনয়, শালীনতা, চারিত্রিক শুভ্রতা ইত্যাদি গুণে আলোকিত ছিল।"'

সমরনীতি (Principles Of War)

সমরনীতি একজন সেনাপতির মাঝে পরিশুদ্ধ মেজাজ ও প্রকৃতি সৃষ্টি করে। ফলে তার সামরিক পদক্ষেপগুলো হয় সংহত ও পরিচ্ছন্ন। এই নীতিগুলোই যুদ্ধের সময় একজন সেনাপতির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি সমরনীতির আলোচনা করব :

লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

মদিনায় আসার পর মদিনাবাসী বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে চুক্তি করেছিলেন, এতেই তাঁর এই নীতিটি স্পষ্ট হয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি যুদ্ধের পূর্বে তিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকতেন।

আগ বেড়ে আক্রমণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকতেন না। বরং আগ বেড়ে আক্রমণ করতেন। কেবল দুটি যুদ্ধে তিনি আগ বেড়ে আক্রমণের সুযোগ পাননি : উহুদ ও খন্দক যুদ্ধ। এই দুটি যুদ্ধে কাফিররাই আগে সেনা-সমাবেশ করেছিল।

আগ বেড়ে আক্রমণ করা মানে কেবল আগে যুদ্ধ শুরু করা নয়। বরং এর মর্ম হলো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে লড়াই করা এবং গোটা রণাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখা—রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কেবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা নয়। কারণ কেবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে সফল হলে সেটিকে প্রকৃত বিজয় বলে না; বরং এটি হলো একধরনের আপেক্ষিক সাফল্য। পক্ষান্তরে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে সাফল্য বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়। আর আগ বেড়ে আক্রমণ হলো আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হামলা

রাসুলুল্লাহ ﷺ শত্রুর ওপর অপ্রত্যাশিত স্থানে অতর্কিত আক্রমণ রচনা করতেন। নতুন রণকৌশল ও হাতিয়ার ব্যবহার করতেন।

শক্তি সঞ্চয়

ওহি নাজিল হওয়ার পর থেকেই তিনি দাওয়াহর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর মুসলিমদের সংগঠিত করার জন্য মদিনা হিজরত করেন। শক্তি সঞ্চয় ও জনবল কেন্দ্রীভূত করার পূর্বে তিনি প্রায়োগিকভাবে জিহাদ শুরু করেননি।

শক্তির সুষম বণ্টন

নিরাপত্তার জন্য এবং শত্রুর দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য ক্ষুদ্র শক্তি ব্যবহার করা।[৩০১]

---

৩০১. শক্তির সুষম বণ্টন মানে যেখানে যতটুকু শক্তি সমাবেশ করা দরকার সেখানে ততটুকু করা।

নিরাপত্তার ওপর জোর প্রদান

দুশমনের আকস্মিক হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াইরত দলগুলোর পারস্পরিক সাহায্য এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ। বিশেষ করে, তথ্য পাচার যেন না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি।

পারস্পরিক সাহায্য

যুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সামরিক ইউনিট ও প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর পারস্পরিক সাহায্য ও সমন্বয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধগুলো মুসলিমদের পারস্পরিক সাহায্য ও সমন্বয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন—যুদ্ধের পূর্বে যেমন, তেমনই যুদ্ধ চলাকালীনও।

অটুট মনোবল

মুসলিম বাহিনীর উদ্যম ও মনোবল সব সময় দৃঢ় ও মজবুত থাকত। ফলে তাঁদের জন্য বিজয় অর্জন করা সহজ হতো।

সামরিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাস

ইসলাম 'জিহাদ বিন নাফস' বা দৈহিক জিহাদের মতো 'জিহাদ বিল মাল' বা আর্থিক জিহাদের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে। বরং কুরআনে বেশির ভাগ আয়াতে জিহাদ বিল মালকে জিহাদ বিন নাফসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়, ইসলাম সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাসকে কতটা গুরুত্ব দেয়।[৩০২]

---

৩০২. অর্থ ছাড়া কখনোই একটি সামরিক বাহিনী সুশৃঙ্খল ও বিন্যস্ত হবে না। মুজাহিদদের পাথেয়ের জোগান, পর্যাপ্ত হাতিয়ার সংগ্রহ, সামরিক সরঞ্জাম তৈরি ও সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই জিহাদ বিল মালের গুরুত্ব অপরিসীম।

আদর্শ সেনাবাহিনী

সংক্ষেপে একজন আদর্শ সৈনিকের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. সুদৃঢ় আকিদা-বিশ্বাস।

২. সুউচ্চ মনোবল।

৩. কঠোর আনুগত্য ও শৃঙ্খলা।

৪. উন্নত প্রশিক্ষণ।

৫. যথাযথ সংগঠন।

৬. উন্নত অস্ত্রের ব্যবহার।

যুগে যুগে এগুলোই হলো কোনো আদর্শ সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য—যা একটি বাহিনীকে শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। এখন প্রশ্ন হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাহিনীর মাঝেও কি এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল? এসব বৈশিষ্ট্যের বিচারে তাঁর বাহিনী কি আরবের অন্যান্য বাহিনী থেকে ভিন্ন ছিল?

বাস্তবতা হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে বর্ণিত সবগুলো বৈশিষ্ট্যে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। মুমিনদের হৃদয়ের জমিতে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য গেঁড়ে দিতে তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করেন। ফলে তাঁরা পরিণত হয় এক অপরাজেয় বাহিনীতে। অথচ কিছুদিন পূর্বেও তারা আরবের অন্য সব গোত্রের মতোই ছিল। ব্যক্তিস্বার্থে ঢাকা ছিল তাঁদের মনের আকাশ। আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও বিন্যাস কী জিনিস তাঁরা বুঝত না। বলতে গেলে, তাঁদের অন্তরে কোনো আকিদাই ছিল না।

কোনো জনগোষ্ঠীর মানসিকতায় এ রকম আমূল পরিবর্তন ঘটানো অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। তবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নুসরত ও সাহায্য অসম্ভবকেও সম্ভব করে দিতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই সাফল্য নিঃসন্দেহে একটি বড় মুজিজা।

আদর্শ সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

সুদৃঢ় আকিদা

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইমান আনার পর ইসলামের প্রতিরক্ষা ও বিজয়ই হয়ে ওঠে মুসলিমদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। ইমান ও আকিদার হিফাজতের জন্য তাঁরা সবকিছু কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁরা জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করেন, ধনসম্পদ পরিত্যাগ করেন—জীবনকে ঠেলে দেন অনিশ্চয়তার পথে। এমনকি দ্বীনের তাগিদে তাঁরা আপন স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করেন। আকিদাগত বিরোধের কারণে পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যাক

সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক ﵁ ছিলেন মুসলিম শিবিরে; তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান ছিল মুশরিক শিবিরে। উতবাহ বিন রাবিআহ ছিল কুরাইশদের সাথে আর তার পুত্র সাইয়িদুনা আবু হুজাইফা ﵁ ছিলেন মুসলিমদের সাথে।

বদরের বন্দীদের ব্যাপারে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তখন সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﵁ প্রস্তাব দেন, 'অমুককে—তিনি নিজের এক আত্মীয়ের নাম করলেন—আমার হাতে সোপর্দ করুন, আমি তার শিরচ্ছেদ করব; আকিল বিন আবু তালিবকে আলির হাতে তুলে দিন, সে তাকে হত্যা করবে; হামজার হাতে তাঁর অমুক ভাইকে তুলে দিন, সে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে—যাতে আল্লাহ তাআলা দেখেন, মুশরিকদের প্রতি আমাদের অন্তরে এতটুকু দুর্বলতা নেই।'[৩০৩]

বদর যুদ্ধে নিহত উতবাহ বিন রাবিআহর লাশ কূপে ফেলে দেওয়ার জন্য যখন টেনে আনা হচ্ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার ছেলে সাইয়িদুনা আবু হুজাইফা বিন উতবাহর দিকে তাকিয়ে দেখেন, তিনি বেশ বিষণ্ন—বিবর্ণ হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। তিনি তাঁকে বলেন :

يَا أَبَا حُذَيْفَةَ، لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ أَبِيكَ شَيْءٌ؟

৩০৩. মুসনাদু আহমাদ : ২০৮। হাদিসের মান : হাসান।

'আবু হুজাইফা, তোমার পিতার জন্য বোধহয় তোমার মন খারাপ হয়েছে?'

সাইয়িদুনা আবু হুজাইফা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম, বিষয়টি এমন নয়, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতাকে নিয়ে কিংবা তার হত্যা নিয়ে আমি ভাবছি না। তবে আমি জানি, আমার পিতা খুবই সহনশীল, বিচক্ষণ ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাই আমার আশা ছিল, এসব গুণ তাকে ইসলামের পথ দেখাবে। যখন দেখলাম তার এই অবস্থা—আমার প্রত্যাশার বিপরীতে যখন তাকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখলাম, আমার মন বিষণ্নতায় ভরে গেল।'[৩০৪]

বনু মুসতালিক যুদ্ধে মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুহাজির ও আনসারদের মাঝে লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের বিরোধ থামিয়ে দেন। যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা যখন মদিনায় পৌঁছয়, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার মুনাফিক পিতাকে হত্যা করব। সে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে।' কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেন :

بَلْ نَتَرَفَّقُ بِهِ وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعنا

'সে যতদিন আমাদের সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে আমরা সুন্দর ও কোমল আচরণ করব।'[৩০৫]

বনু কুরাইজার যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ইহুদিরা সাইয়িদুনা আবু লুবাবা ﷺ-এর সঙ্গে পরামর্শের জন্য তাঁকে দুর্গে পাঠানোর আবেদন করল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইহুদিদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অবরুদ্ধ ইহুদিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'মুহাম্মাদের নির্দেশে দুর্গ থেকে অবতরণ করা কি আপনি সমীচীন মনে করেন?' তিনি মুখে বললেন, 'হাঁ; কিন্তু হাত দিয়ে গলার

---

৩০৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৬৪০।
৩০৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৯৩।

দিকে ইশারা করে বোঝালেন, তোমাদের জবাই করা হবে।'[৩০৬] সাথে থাকা মুসলিমদের কেউ বিষয়টি ধরতে পারলেন না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি নিজে উপলব্ধি করতে পারলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে তিনি খিয়ানত করে ফেলেছেন। তাই অস্থির মনে তিনি দ্রুত সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং সোজা মসজিদে নববিতে গিয়ে একটি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললেন। যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা আসেনি, তিনি নিজের বাঁধন খুলেননি।[৩০৭]

মক্কা-বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আবু সুফইয়ান বিন হারব মদিনায় আসেন।[৩০৮] তিনি প্রথমে তাঁর কন্যা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার ঘরে যান। কিন্তু উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা ﷺ তাঁর পিতাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় বসতে দেননি। তিনি বসার আগেই এই বলে বিছানা গুটিয়ে ফেলেন যে, একজন নাপাক মুশরিকের স্পর্শ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বিছানায় লাগতে পারে না।[৩০৯]

মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের ধনসম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক ﷺ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে চল্লিশ হাজার দিনারের মালিক ছিলেন। কিন্তু দ্বীনের কল্যাণে দান করতে করতে তিনি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সুদৃঢ় আকিদা ও গভীর ইমান ব্যতীত মুসলিমরা কীভাবে এই ধরনের কাজ করতে পেরেছেন?

এমন আকিদা ও ইমানের অধিকারী জনগোষ্ঠীর লড়াই কি তাদের মতো হবে, জাহিলি ধ্যানধারণা, ব্যক্তিস্বার্থ ও খ্যাতির লালসা ছাড়া যাদের কোনো আকিদাই নেই।

মুসলিমদের সুদৃঢ় আকিদা ও বিশ্বাস তাঁদের অন্তরে সৃষ্টি করেছে মহান সব স্বপ্ন ও লক্ষ্য—যা অর্জনের জন্য তাঁরা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিতেও পরোয়া করে না।

---

৩০৬. যেন তিনি বোঝালেন, মুহাম্মাদের নির্দেশে তোমরা দুর্গ থেকে নেমো না। তিনি তোমাদের জবাই করবেন।

৩০৭. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৩৭।

৩০৮. তিনি তখনো মুসলিম হননি।

৩০৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৩৯৬।

উচ্চ মনোবল

কোনো সেনাবাহিনী সংখ্যায় যত বেশিই হোক, বিন্যাসে যত পরিপাটিই হোক, অস্ত্রশস্ত্রে যত উন্নতই হোক, যদি সৈনিকদের উচ্চ মনোবল না থাকে, তবে এই বাহিনী দিয়ে বিজয়ের আশা করা যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালীয় বাহিনী সর্বাধুনিক ও বিধ্বংসী সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের নিখুঁত সামরিক ব্যবস্থাপনা ও সংখ্যাধিক্যও ছিল দেখার মতো। কিন্তু তাদের মনোবল ছিল ভাঙা। তাই তারা জার্মানির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ইতালীয় সেনাবাহিনীর অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে মিত্রশক্তি বলত, 'সামরিক শূন্য এলাকা।' কারণ ইতালীয়রা লড়াই না করেই অস্ত্র সমর্পণ করে বসত। যখনই আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিত, তা বাস্তবিক হোক বা কাল্পনিক, তারা ময়দান ছেড়ে সটকে পড়ত। তাই তাদের থাকা না থাকা ছিল বরাবর।

বদর যুদ্ধের পূর্বে এবং লড়াই চলাকালীন রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করেন; চাঙা করে তোলেন তাঁদের মনোবল। তাই কুরাইশের সংখ্যাধিক্যকে তাঁরা মোটেও পাত্তা দেননি। এই উচ্চ মনোবলই সহজ করেছে তাঁদের বিজয়ের পথ।

এমনকি কিশোর সাহাবিদের মনোবলও ছিল তুঙ্গস্পর্শী। আবু জাহেলকে হত্যাকারী আফরার সেই দুই সন্তানের ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়।

যদি মুসলিম বাহিনীর সুউচ্চ মনোবল না থাকত, তবে তাঁরা কি বদর যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারতেন? উহুদের ময়দানে মুশরিকদের তাড়াতে পারতেন? খন্দক যুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকতে পারতেন? তাবুক যুদ্ধে অগ্রসর হতে পারতেন?

রাসুলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অবলম্বন করে মুসলিম বাহিনীর সাহস ও মনোবল চাঙা করতেন এবং দুশমনদের মনোবল ভেঙে দিতেন। হুদাইবিয়া, উমরাতুল কাজা, তাবুক ইত্যাদি ছিল মূলত মনস্তাত্ত্বিক লড়াই—শক্তির যুদ্ধ নয়।

উমরাতুল কাজা মক্কার লোকদের অন্তর জয় করে নিয়েছিল, ভেঙে দিয়েছিল তাদের সামরিক মনোবলের শক্ত প্রাচীর। মক্কা অভিযান তো কেবল নগরের ফটকগুলো বিজয় করেছিল।

অনুরূপভাবে তাবুক যুদ্ধের ফলাফল রোমকদের মনোবল ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। এই লড়াইয়ের মাধ্যমে আরবরা বুঝতে পারে, রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সক্ষমতা তাদের আছে—অথচ পূর্বে তারা এটিকে অসম্ভব মনে করত।

প্রতিটি যুদ্ধেই রাসুলুল্লাহ ﷺ দুশমনের মনোবল ধসিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। এমনকি শত্রুর মানসিক শক্তি ধ্বংস করার প্রতি তিনি তাদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করার চেয়েও বেশি জোর দিয়েছেন। কারণ তিনি চাইতেন শত্রুরা ইসলামের পথে ফিরে আসুক—হিদায়াত লাভ করুক। তাই তো তিনি দোয়া করতেন : (اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) 'আল্লাহ, আমার জাতিকে হিদায়াত দিন; তারা তো অবুঝ।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল মনস্তাত্ত্বিক—যা দুশমনদের মনোবল ভেঙে চুরমার করে দিত।

মুসলিমদের উচ্চ মনোবলের নেপথ্যে তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আকিদার কারণে তাঁরা বীরবিক্রমে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। কারণ তাকদিরে যা লেখা আছে, তা সংঘটিত হবেই। আর শহিদ জান্নাতের বাসিন্দা। মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য সামনে কেবল দুটিই পথ : বিজয় বা শাহাদাত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ﴾

'আপনি বলে দিন, "তোমরা কেবল আমাদের দুটি কল্যাণের (বিজয় বা শাহাদাত) একটির প্রতীক্ষা করছ আর আমরা প্রতীক্ষা করছি, আল্লাহ তাআলা তোমাদের শাস্তি দেবেন সরাসরি তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।"'[৩১০]

৩১০. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৫২।

কঠোর আনুগত্য ও শৃঙ্খলা

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মুসলিমদের আনুগত্যের কোনো সীমা ছিল না। তাঁরা তাঁদের মহান সর্দারের প্রতিটি নির্দেশ পরিপূর্ণ আগ্রহ ও বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন—পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, দায়িত্ব যতই কঠিন হোক, তাঁরা কোনো কিছুর পরোয়া করতেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের অগণিত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সিরাতের পাতায় পাতায়। কারণ আনুগত্য দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর[৩১১] তাদের।'[৩১২]

উন্নত প্রশিক্ষণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ তিরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি ইরশাদ করেন :

مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا

'যে ব্যক্তি তিরন্দাজি শেখার পর অনাগ্রহবশত তা ছেড়ে দেয়, সে একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করে!'[৩১৩]

কেবল তিরন্দাজি ও অশ্বচালনার মতো একক প্রশিক্ষণ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, সাহাবিদেরকে তিনি সমন্বিত প্রশিক্ষণও দিয়েছেন—যুদ্ধের সেনাবিন্যাস, আক্রমণের কলাকৌশল, প্রহরার নিয়মনীতি ও বিভিন্ন সামরিক কায়দা-কানুন ইত্যাদিও শিখিয়েছেন।

---

৩১১. উলুল আমর মানে কর্তৃত্বশীল। যেমন : খলিফা, কাজি, সেনাপতি ইত্যাদি।

৩১২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৫৯।

৩১৩. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩০০, সুনানু আবি দাউদ : ২৫১৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮১১, সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪৬। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি।

প্রতিটি যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে কৌশলগতভাবে বিন্যস্ত (Tactical Formation) করতেন। ফলে বাহিনীর বিভিন্ন দলকে জরুরি সাহায্য প্রদান ও শত্রুর আকস্মিক হামলা ঠেকানো সহজ হতো।

বদর ও উহুদসহ অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি সারি পদ্ধতিতে সেনাসমাবেশ করেছিলেন। খন্দক যুদ্ধে পরিখার পেছনে তিনি প্রতিরক্ষা চৌকি স্থাপন করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি পরিখার দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি 'নগর আক্রমণ' (Urban Warfare) পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। যেমন উহুদ যুদ্ধের পর সারিয়্যায়ে আবু সালামা[৩১৪] বনু আসাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন কঠিন ও সংকটসংকুল পরিস্থিতিতেও সাহাবিরা রাত-দিন যুদ্ধ করেছেন। এসব যুদ্ধে নিরঙ্কুশ সাফল্য প্রমাণ করে, মুসলিম বাহিনী উন্নত প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। আর এই একক ও সমন্বিত প্রশিক্ষণগুলো মুসলিম বাহিনীকে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিল।

যথাযথ সংগঠন

মুসলিম বাহিনী গঠিত হয়েছিল মুহাজির, আনসার ও সমকালীন প্রসিদ্ধ কবিলাগুলোর মুসলিমদের নিয়ে। এখান থেকে বোঝা যায়, মুসলিম বাহিনী কোনো গোত্রীয় বাহিনী ছিল না। তাই এই বাহিনীর বিজয় বিশেষ কোনো গোত্রের জন্য খ্যাতি বয়ে আনত না। অনুরূপভাবে এই বাহিনীর পরাজয় কোনো বিশেষ গোত্রের জন্য দুর্নামের কারণ হতো না। কারণ এই বাহিনী বিশেষ কোনো গোত্রের নয়। এমনকি এটি কোনো আরব বাহিনীও নয়। বরং এই বাহিনী ইসলামের বাহিনী। আরব বা আজমের যারাই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে, এটি তাদের সবার বাহিনী।

এমন একটি বাহিনী কেবল ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের জন্যই লড়াই করবে; অন্য কোনো নীতি ও সংস্কারের জন্য তারা যুদ্ধ করবে না। তাই বিশেষ কোনো

---

৩১৪. চতুর্থ হিজরিতে মুহাররমের চাঁদ ওঠার সময় মদিনা থেকে এই বাহিনী পাঠানো হয়। (জাদুল মাআদ : ২/১০৮)

গোত্রের স্বার্থের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। ফলে মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের মাঝে কোনো ধরনের অনৈক্য ও মতবিরোধ দেখা দেয়নি।

উন্নত অস্ত্র

মুসলিম বাহিনীর হাতিয়ার ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত সমরাস্ত্রে মুশরিকরা মুসলিমদের চেয়ে এগিয়ে ছিল।

মক্কা-বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং মুসলিম বাহিনীর যে সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাকে বলা হয় : (الْكَتِيبَةُ الْخَضْرَاءُ)[৩১৫] 'ব্ল্যাক ব্যাটালিয়ন' বা 'কালো সেনাদল।' এই ব্যাটালিয়নের সদস্যদের পুরো শরীর ছিল লোহার পোশাকে আচ্ছাদিত—কেবল চোখের মণিটি দেখা যাচ্ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ অস্ত্রশস্ত্র তৈরির প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। সাইয়িদুনা উকবাহ বিন আমির رضي الله عنه বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ. وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا

'আল্লাহ তাআলা একটি তিরের মাধ্যমে তিনজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন : এক. তিরটির প্রস্তুতকারী—যে সাওয়াবের আশায় সেটি প্রস্তুত করেছে। খ. তিরটি নিক্ষেপকারী। ও গ. তির সরবরাহকারী।[৩১৬] তোমরা তিরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। আমার কাছে অশ্বচালনার চেয়ে তিরন্দাজি অধিক প্রিয়।'[৩১৭]

---

৩১৫. (الْكَتِيبَةُ الْخَضْرَاءُ) এর আভিধানিক অর্থ হলো সবুজ ব্যাটালিয়ন। আরবরা রূপকার্থে কালোকে সবুজ বলে থাকে। এখানে (الْخَضْرَاءُ) 'সবুজ' মানে (السوداء) কালো। ওই ব্যাটালিয়নের সব সৈনিক সর্বাঙ্গে লোহার কালো পোশাক পরেছিলেন। তাই এই নাম। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ : ৫/২৮৩)

৩১৬. তির সরবরাহকারী হলো সে ব্যক্তি, যে তিরন্দাজের পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক তির তার হাতে তুলে দেয় এবং প্রতিপক্ষের তির থেকে তাকে রক্ষা করে।

৩১৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩০০, সুনানু আবি দাউদ : ২৫১৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮১১, সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪৬। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি।

ন্যায় যুদ্ধ (Just War)

ন্যায় যুদ্ধ হলো অত্যাচার ও দুঃশাসন নির্মূলের লড়াই, মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে লড়াই। তবে শর্ত হলো এই যুদ্ধে—

- মানবিক নীতিমালা লঙ্ঘিত হতে পারবে না।
- স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- নিরপরাধ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।
- বন্দী ও জিম্মিদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করতে হবে।

এগুলোই ন্যায় যুদ্ধের সারকথা। যুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনের উৎসগুলো এসব কথাই বলে।

সুতরাং বোঝা গেল, ন্যায় যুদ্ধ হলো মুক্তির লড়াই, কোনো আগ্রাসন নয়। এই লড়াই মানবিক উদ্দেশ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়; যেখানে নিরপরাধ বেসামরিক জনগণের সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং বন্দিদের জন্য ন্যায়সংগত আচরণ করা হয়।

১৪শ বছর পূর্বে প্রণীত ইসলামের যুদ্ধ আইন বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের চেয়েও অধিক ন্যায়সংগত। এ ছাড়াও ইসলাম বর্ণবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বার্থের জন্য লড়াইয়ের অনুমোদন দেয় না। কোনো বস্তুগত স্বার্থে কিংবা সাম্রাজ্যবাদী লালসা চরিতার্থে অথবা ভিনদেশে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন চালানোর লক্ষ্যেও ইসলাম লড়াইয়ের অনুমতি দেয় না। ইসলাম মত ও বিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।[৩১৮]

---

৩১৮. ইসলাম পারতপক্ষে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। কাউকে জোর করে মুসলিম হতে বাধ্য করে না। মুসলিম বাহিনী যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন মুসলিম সেনাপতি কাফিরদেরকে তিনটি প্রস্তাবের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে বলবে : ১. তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। অথবা ২. জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করো। এই দুটির কোনো একটিও যদি গ্রহণ না করো, তবে ৩. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। (সহিহু মুসলিম : ১৭৩১)। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইসলামি খিলাফতের আনুগত্য মেনে নেওয়ার পর মুসলিম বাহিনী কাফিরদের ওপর হাতও তুলবে না এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্যও করবে না। তাদেরকে তাদের মত ও বিশ্বাস লালনের অনুমতি দেওয়া হবে।

এখানে আমরা ন্যায় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব :

আক্রমণাত্মক রক্ষণশীল যুদ্ধ

দীর্ঘ তেরোটি বছর কুরাইশরা মুসলিমদের ওপর অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন বাড়তে বাড়তে এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, আপন বাস্তুভিটা, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে হিজরত করা ছাড়া মুসলিমদের সামনে আর কোনো উপায় বাকি থাকেনি। তাই তাঁরা প্রথমে সাময়িকভাবে হাবশা হিজরত করেন; পরে স্থায়ীভাবে মদিনায় হিজরত করেন।

অনেক মুসলিমকে তাঁদের স্বজনরা কাফিরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিল। আর যাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না, তাঁদের অনেকেই নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শহিদ হয়ে যান।

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কুরাইশরা তাঁকে মিথ্যুক বলে, তাঁকে অপমানিত করে—দাওয়াহর কাজে বাধা দেয়। তিনি অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে তাদের এসব জুলুম বরদাশত করেন। সাহসিকতার সাথে নতুন দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদের সকল চক্রান্তের মোকাবিলা করেন।

কুরাইশের পার্লামেন্টে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। হিজরতের পথেও তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ধাওয়া করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টায়ও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

কুরাইশরা মুসলিমদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে, তার চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে? কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, তিনি তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

মক্কা-বিজয়ের দিন নিতান্ত অপারগ না হলে কাউকে হত্যা করা হয়নি। কোনো দুশমনের মধ্যে ইসলামের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখতে পেলেই রাসুলুল্লাহ ﷺ সে আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তাকে মুসলিম বানানোর চেষ্টা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধসমূহ নিয়ে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুসলিমগণ কোনো যুদ্ধে কারও ওপর সীমালঙ্ঘন করেননি। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, মুসলিমগণ এসব যুদ্ধে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। মক্কা-বিজয়ের পরও অনেকেই মুশরিক থেকে গিয়েছিল এবং তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছে। যেমন : সাফওয়ান বিন উমাইয়া[৩১৯] ও কিলদাহ বিন জুনাইদ। মুসলিমরা জানতেন, এই লোকগুলো তাদের পূর্বের বিশ্বাসে এখনো বহাল আছে। তবুও তাদেরকে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করেননি। অথচ চাইলে তাঁরা সবাইকে জোর করে মুসলিম বানাতে পারতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾

'দ্বীন গ্রহণে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।'[৩২০]

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ﴾

'তোমার রব ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সবাই মুমিন হয়ে যেত; তবে আপনি কি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন?'[৩২১]

'জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল দাওয়াহকে সম্প্রসারিত করা'—এটি একটি অসার ও ভিত্তিহীন বক্তব্য। বরং জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াহ সম্প্রসারণের বাধাগুলো ধ্বংস করে দাওয়াহর স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা, দাওয়াহ কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও বেগবান করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। উভয় উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে বিশাল ফারাক।

৩১৯. সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে ইসলামগ্রহণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ চার মাস সময় দিয়েছিলেন।
৩২০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৫৬।
৩২১. সুরা ইউনুস, ১০ : ৯৯।

ইসলামের জিহাদ রক্ষণশীল এবং জুলুম ও আগ্রাসনে বিশ্বাস করে না; তবে এই রক্ষণশীলতা স্থির ও নিষ্ক্রিয় নয়; বরং সক্রিয় ও আক্রমণাত্মক—যেমনটি আধুনিক সামরিক পরিভাষায় বলা হয় : (الدِّفَاعِيُّ التَّعَرُّضِيُّ) আক্রমণাত্মক রক্ষণশীল। এর অর্থ হলো, মুসলিমরা পারতপক্ষে যুদ্ধ এড়িয়ে চলেন। যুদ্ধ তাঁদের কাছে সর্বশেষ অপশন।[৩২২]

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ

হিজরতের পর মদিনার মুশরিক ও ইহুদিরা সন্ধি করতে চাইলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং তাদের এই মানসিকতাকে উৎসাহিত করেন। সবার সঙ্গে তিনি এমন একটি চুক্তি করেন, যা মদিনায় শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সন্ধি করতে ইচ্ছুক সকল গোত্রের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ চুক্তি করেন। যেমন : গাজওয়ায়ে ওয়াদ্দানে বনু জামরার সঙ্গে, গাজওয়ায়ে উশাইরায় বনু মুদলিজের সঙ্গে এবং হুদায়বিয়ায় কুরাইশদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি ছাড় দিয়ে হলেও চুক্তি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। গাজওয়ায়ে হুদাইবিয়ায় একদল সাহাবির তীব্র অসন্তোষ উপেক্ষা করে তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

হুদাইবিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তির ফলে আরবের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে ওঠে। ফলে চারদিকে দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের দাওয়াহ। যুদ্ধের সময়ের চেয়ে যুদ্ধবিরতির সময় ইসলামের দাওয়াহ কয়েকগুণ বেশি প্রসারিত হয়েছে।

---

৩২২. ইসলাম পারতপক্ষে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। কাউকে জোর করে মুসলিম হতে বাধ্য করে না। মুসলিম বাহিনী যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন মুসলিম সেনাপতি কাফিরদেরকে তিনটি প্রস্তাবের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে বলবে : ১. তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। অথবা ২. জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করো। এই দুটির কোনো একটিও যদি গ্রহণ না করো, তবে ৩. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। (সহিহু মুসলিম : ১৭৩১)। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইসলামি খিলাফতের আনুগত্য মেনে নেওয়ার পর মুসলিম বাহিনী কাফিরদের ওপর হাতও তুলবে না এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্যও করবে না। তাদেরকে তাদের মত ও বিশ্বাস লালনের অনুমতি দেওয়া হবে।

মৈত্রীচুক্তি ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾

'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির প্রতি আগ্রহী হোন; আর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৩২৩]

তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুশমনের সকল সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করতে দেখে এবং মৈত্রীচুক্তির প্রতি এত আগ্রহী দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ইসলাম পারতপক্ষে সংঘাত এড়িয়ে চলতে চায়। কোনো উপায় বাকি না থাকলেই কেবল লড়াইয়ের অপশন গ্রহণ করা হয়।

তবে মনে রাখতে হবে, ইসলাম সন্ধির কথা বললেও আত্মসমর্পণের কথা বলে না। যে সন্ধি করতে চায়, ইসলাম তার সঙ্গে সন্ধি করে আর যে শত্রুতা করতে চায়, ইসলাম তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ইসলাম কারও প্রতি জুলুম যেমন করে না, তেমনই সীমালঙ্ঘনও করে না। অনুরূপভাবে মুসলিমদেরকেও জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের অনুমতি দেয় না।

মানবিক যুদ্ধ

যুদ্ধে ইসলাম কখনো মানবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে না। এবার আমরা জানব, যুদ্ধের সময় ইসলাম কীভাবে মানবতার সীমানা ঠিক রাখে।

বেসামরিক ও নিরপরাধ লোকদের নিরাপত্তা

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো বেসামরিক নিরপরাধ লোকজনকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাননি। বরং তাদের জানমালের নিরাপত্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

বনু কুরাইজা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন মুসলিমগণ কেবল গোত্রের যোদ্ধাদেরকেই হত্যা করেন। কারণ তারা গাদ্দারি করে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল

---

৩২৩. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬১।

এবং মুসলিমদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পাঁয়তারা করেছিল। তবে গোত্রের নারী ও শিশুদের কোনো ক্ষতি করা হয়নি। অনুরূপভাবে যেসব ইহুদির ব্যাপারে চুক্তির ওপর অটল থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, তাদেরকেও কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়নি।

বনু কুরাইজার একটি মাত্র নারীকে হত্যা করা হয়েছিল; কারণ সে জনৈক মুসলিমকে জাঁতার চাক্কি ছুড়ে হত্যা করেছিল। এটি ছিল কিসাস তথা হত্যার বদলায় হত্যা।

মুসলিম বাহিনী যখন মুতার যুদ্ধের জন্য মার্চ করছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উপদেশ দেন, 'তোমরা নারী, শিশু ও নিরপরাধ লোকদের হত্যা করো না; ঘরবাড়ি ধ্বংস করো না; গাছপালা কেটো না।'

একজনের অপরাধের শাস্তি অপর জনকে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

'একজনের দায়ভার অন্যজন বহন করবে না।'[৩২৪]

এটিই ইসলামের মূলনীতি। এই মূলনীতির বাইরে কেউ নেই।

বন্দী ও জিম্মিদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ

বদর যুদ্ধে মুসলিমরা কুরাইশের ৭০ জন কাফিরকে বন্দী করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ৬৮ জনকে সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে বলেন :

«اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا»

'তোমরা বন্দীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।'[৩২৫]

তারপর বন্দীদের তিনি মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না, তাদের মধ্যে যারা পড়ালেখা জানত, তাদেরকে

---

৩২৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৬৪।
৩২৫. আল-মুজামুস সাগির লিত তাবারানি : ৪০৯।

দশজন আনসারকে পড়ালেখা শেখানোর ভার দেওয়া হয়। এটিই ছিল তাদের মুক্তিপণ। কয়েকজনকে তিনি কোনো বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দেন।

মাত্র দুজন বন্দীকে হত্যা করা হয়।[৩২৬] কারণ তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মারাত্মক গর্হিত অপরাধ করেছিল এবং মক্কার দুর্বল মুসলিমদের নির্যাতন করেছিল। তাই তাদের বন্দী হিসেবে নয়, তাদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হয়।

আধুনিক সামরিক পরিভাষা অনুযায়ী তারা ছিল যুদ্ধাপরাধী। তাদেরকে তাদের অপরাধের সাজা দেওয়া হয়েছে।

সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন জাহশের হাতে যে দুজন মুশরিক ধৃত হয়েছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকেও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে, অপর জন নিরাপদে মক্কা ফিরে যায়।

এই ছিল বন্দীদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ। বর্তমানে বন্দী-বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক আইন, তার চেয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বন্দী আইন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

আর গনিমত নিয়ে মুসলিমরা কোনো ধরনের খিয়ানত করেছে, ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই। কারণ গনিমত হলো আমানত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা জেনেবুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে গাদ্দারি করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেও খিয়ানত করো না।'[৩২৭]

৩২৬. তারা হলো, উকবা বিন আবু মুআইত ও নাজার বিন হারিস।
৩২৭. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২৭।

আহত ও নিহতদের সঙ্গে মানবিক আচরণ

বদরের বন্দীদের একদল ছিল আহত। সাহাবিগণ আহতদের সেবায় মুসলিম-মুশরিক ভেদাভেদ করেননি। বরং উভয়ের সমান পরিচর্যা করেছেন।

বদরের নিহতদেরও মুসলিমরা খোলা মাঠে ফেলে আসেননি। তারা মুশরিকদের লাশগুলোও দাফন করে দিয়েছিলেন। অথচ উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা মুসলিমদের লাশগুলোকে কেটেকুটে বিকৃত করেছিল।

আকিদার লড়াই

মুসলিমদের লড়াইয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এই লড়াই আকিদা ও বিশ্বাসের লড়াই। নিম্নে আমরা কয়েকটি পয়েন্টে বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরব :

ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে

জিহাদ ব্যক্তিস্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি দেয় না। কারণ ইসলাম সর্বসাধারণের কল্যাণের কথা বলে—যদিও এতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

ইসলাম কখনো ব্যক্তিবিশেষের খ্যাতি কিংবা ক্ষমতার লালসা চরিতার্থ করতে যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি দেয় না। একবার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উতবাহ বিন রাবিআহকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠায়। সে ছিল খুবই প্রশান্ত ও গম্ভীর চিত্তের মানুষ। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সে বলে, 'ভাতিজা, আমি জানি, তুমি আমাদের মাঝে একজন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তুমি জাতির সামনে এক বিশাল সমস্যা এনে দাঁড় করিয়েছ। তুমি তাদের ঐক্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছ। এখন আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দেবো; হয়তো তোমার যেকোনো একটি পছন্দ হয়ে যাবে। তুমি যদি সম্পদের জন্য এসব করে থাকো, তবে আমরা আমাদের সব সম্পদ তোমার পায়ে উপুড় করে দেবো, তুমি আরবের সবচেয়ে বড় ধনীতে পরিণত হবে। তুমি যদি নেতৃত্বের জন্য এসব করে থাকো, তবে আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার মেনে

নেব, তোমার অনুমতি ছাড়া আমরা কোনো কাজ করব না। তুমি যদি রাজত্ব চাও, তবে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেব।'

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে কুরাইশদের জুলুম ও দুশমনির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ক্রমবর্ধমান এই শত্রুতা ও অনৈক্য দেখে আবু তালিব বিচলিত হয়ে পড়েন; রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দেন দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করে দেওয়ার। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবুও আমি এই দাওয়াহ থেকে পিছু হটব না। হয় আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করবেন, নয় আমি এই দাওয়াহর পেছনে নিজেকে বিলিয়ে দেবো।'

তিনি প্রায়ই এই আয়াতটি আওড়াতেন :

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ﴾

> 'আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার কাছে ওহি আসে যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।'[৩২৮]

ফকির, মিসকিন, দুর্বল ও কর্মচারীদের তিনি কখনো অবহেলা করতেন না। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণ মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

দাওয়াহর পথ নিষ্কণ্টক করাসহ বহু দ্বীনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলাম জিহাদের বিধান দিয়েছে। তবে কোনোভাবেই ব্যক্তিস্বার্থের জন্য লড়াই করার সুযোগ ইসলামে নেই।

জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে

ইসলামে বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম কোনো বিশেষ গোত্রের নয়, কোনো বিশেষ জাতির নয়; ইসলাম কেবল আরবেরও নয়—বরং ইসলাম গোটা মানবজাতির। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

৩২৮. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১১০।

'বলুন, "হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।"'[৩২৯]

ইসলামের চিন্তার পরিধি পুরো বিশ্বকে ধারণ করে, ইসলাম জগতের সকল মানুষের কথা বলে, সকল মানুষকে ইসলামের ঝান্ডার নিচে সমবেত করার লক্ষ্যে কাজ করে।

গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির সংকীর্ণতাকে ইসলাম ছুড়ে ফেলে; বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের নোংরামিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। কারণ ইসলাম গোটা পৃথিবীকে তাওহিদের ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।'[৩৩০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

'হে মানুষ, মনে রেখো, তোমাদের রব এক—তোমাদের পিতা এক। মনে রেখো, অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; অনারবেরও আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই; কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়ার বিচারে।'[৩৩১]

কুরআন-সুন্নাহর এসব বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়া; ইসলাম কিতাব ও তরবারি; ইসলাম চূড়ান্ত সংবিধান ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

---

৩২৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৮।

৩৩০. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১০।

৩৩১. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৪৮৯। হাদিসের মান : হাসান।

জার্মানি যে সামাজিক যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে আজও চলছে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ দ্বন্দ্ব। এসব চলছে বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত আধুনিক বিশ্বে—সভ্যতা, সংস্কৃতি, পারমাণবিক প্রযুক্তি ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে!

অথচ ইসলাম ১৪শ বছর পূর্বেই এই নিকৃষ্ট বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছে। মানুষকে পরিচালিত করেছে জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে। যে-ই ইমান এনেছে, তার জান-মাল-ইজ্জত মুসলিমদের জন্য হারাম হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'আমাকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর সালাত কায়িম করে এবং জাকাত আদায় করে। তারা যদি এসব করে, তবে তারা আমার পক্ষ হতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে—তবে ইসলামের হকের (হুদুদ ও কিসাস) কথা ভিন্ন। আর তাদের (অন্তরের) হিসাবের ভার আল্লাহর হাতে।'[৩৩২]

তিনি আরও বলেন :

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»

'মুসলিম মুসলিমের ভাই।'[৩৩৩]

---

৩৩২. সহিহুল বুখারি : ২৫।
৩৩৩. সহিহুল বুখারি : ২৪৪২।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ ছিলেন; কিন্তু কুরাইশরা যখন মুসলিমদের ওপর জুলুম করল, তিনি আপন খান্দানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। তিনি আরব ছিলেন; কিন্তু আরবরা যখন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চাইল, তিনি আপন জাতির বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করলেন।

রোমকরা যখন দাওয়াহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর খলিফাগণ রোম ও পারস্যসহ বহু জাতি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ যারা একসময় ইসলামের দুশমন ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা মুসলিম সমাজে একাকার হয়ে যায়—যেখানে সবার অধিকার সমান।

ইসলাম মানুষের মাঝে ইনসাফের ঘোষণা দেয়—দুনিয়াতে যেমন আখিরাতেও; মানুষের সামনে যেমন আল্লাহর সামনেও। ইসলাম তাকওয়াকেই স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি নির্ধারণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴾

> 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।'[৩৩৪]

পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধ্বে

ধনসম্পদ করায়ত্তকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, মানুষকে গোলাম বানানো কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইসলাম যুদ্ধের নির্দেশ দেয়নি।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলিমরা আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য-কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিল কুরাইশদের জন্য মক্কা-শাম বাণিজ্য রুটটিকে বন্ধ করে দিতে—যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলিমদের ওপর আর ছড়ি ঘোরাতে না পারে।

---

৩৩৪. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

কিন্তু এই কাফেলা মুসলিমদের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়; তবুও তারা মুশরিকদের সঙ্গে সংঘাতে জড়ান; অথচ তারা চাইলে নিরাপদে মদিনা ফিরতে পারতেন। তারা যদি নিছক বাণিজ্য-কাফেলা লুট করার জন্য বদরের দিকে রওনা হতেন, তাহলে কাফেলা নিরাপদে মক্কা পৌছার খবর শুনে তারা অবশ্যই ফিরে আসতেন।

হুনাইন যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ দশ দিনেরও বেশি সময় গনিমত বণ্টন এই আশায় বিলম্বিত করেছিলেন যে, হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে তাওবা করে মুসলিম হয়ে যাবে এবং তিনি তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু তারা এল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি গনিমত বণ্টন করে দিলেন। বণ্টনের পরও যখন তারা এল, তিনি বন্দীদের ফিরিয়ে দিলেন।[৩৩৫]

কিন্তু গনিমতের কতটুকু রাসুলুল্লাহ ﷺ পান? তিনি পান এক-পঞ্চমাংশ। এই অংশটুকুও মুসলিমদের মাঝেই বণ্টিত হয়ে যায়। কারণ এই এক-পঞ্চমাংশের প্রায় পুরোটাই সামরিক ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হয়ে থাকে। তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে কিই বা আর বাকি থাকল?

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখ জীবন বড়ই বিস্ময়কর। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা رضي الله عنها বলেন :

«مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো টানা তিন দিন গমের রুটি খাননি; এই অবস্থায়ই তিনি আল্লাহর কাছে চলে যান।'[৩৩৬]

---

৩৩৫. এখানে লেখক কেবল এতটুকু বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলামে জিহাদের বিধান নিছক পার্থিব ধনসম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে নয়। তবে জিহাদে যে গনিমত পাওয়া যায়, তা মুমিনদের জন্য নিয়ামত। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : («جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي») 'আমার রিজিক রাখা হয়েছে, আমার বর্শার ছায়াতলে এবং যে আমার আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করে, তার ওপর হীনতা ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (সহিহুল বুখারি : ৪/৪০) সহিহ বুখারিতে হাদিসটি তালিকান এসেছে। হাদিসটির মান : হাসান।

৩৩৬. সহিহ মুসলিম : ২৯৭০।

✷

স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে বদর যুদ্ধে বিশাল কুরাইশ বাহিনির মোকাবেলায় বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে যাওয়া তাঁর বিরল সাহসের পরিচয় বহন করে। খন্দক যুদ্ধে ১০,০০০ বাহিনির সামনে তিনি প্রদর্শন করেন অবিচলতার পরাকাষ্ঠা। হুনাইন যুদ্ধে মাত্র দশজন মুজাহিদ নিয়ে তিনি পর্বতের মতো অটল থাকেন দুশমনের তিরবৃষ্টির সামনে—এমন সাহস সত্যিই বর্ণনাতীত!

✷

'উজ্জ্বল ঝলমলে দেহাবয়ব, প্রদীপ্ত চেহারা, সুদর্শন গড়ন; ছিমছাম শরীর—দেহের ভার তার ওপর চেপে বসেনি; মাথা মাঝারি আকারের—খর্বাকৃতির মাথা তার সৌন্দর্য বিনষ্টের কারণ হয়নি। তিনি সুন্দর ও পরিপাটি। ডাগর ডগর কালো দুটি চোখ; চোখের পাপড়ির লোমগুলো ঘন ও দীর্ঘ। ভরাট কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও কঠিন। উন্নত ঘাড়। শুভ্র নয়নে নিকষ কালো মণি। ভ্রূগুলো সরু, দীর্ঘ ও সন্নিবিষ্ট। ঘন কালো চুল। যখন নীরব থাকেন, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গাম্ভীর্য আর যখন সরব হন, দীপ্তি ছড়ায় তাঁর বাকমাধুর্য। অনন্য সাধারণ সুন্দর পুরুষ। দূর থেকে দেখলে সুদর্শন আর কাছে এলে সুমধুর। সুমিষ্ট সুস্পষ্ট ভাষা; পরিমিত কথা—বাড়াবাড়ি যেমন নেই, ছাড়াছাড়িও নেইঃ মুখ থেকে যেন সুবিন্যস্ত মুক্তোদানার ন্যায় ঝরে পড়ে।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহই মানবজীবনের সাফল্য ও কামিয়াবির একমাত্র পথ। আর সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে আপনাকে যেতে হবে সিরাতুন্নবির আলোকিত পাঠশালায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জীবন ও তাঁর সুন্নাহ সম্পর্কে জানার লক্ষ্যেই আমাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন: প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক, সমরবিদ শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব বিরচিত—

'সিরাত কাননের মুঠো মুঠো সৌরভ'

বইটির বিন্যাস প্রচলিত সিরাতগ্রন্থ থেকে একেবারেই আলাদা। শাইখ এখানে সিরাতশাস্ত্রের অনেকগুলো শাখার সারনির্যাস নিয়ে এসেছেন। তাই সিরাত পাঠের ভূমিকা হিসেবে বইটি বেশ উপযোগী মনে হয়। যারা দীর্ঘ পরিসরের সিরাত পড়ার পূর্বে গোটা সিরাতকে একনজরে দেখে নিতে চান, আমরা বলব, তাদের জন্য বইটি চমৎকার এক উপহার।